ETHICS (INDIAN AND WESTERN)

BA [Philosophy)

Third Semester

Paper III

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Gargi Mitra

(Rtd. Professor of Charuchandra College)

Author: Dr. Pratip Kumar Chatterjee

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-8)**

পরমার্থ এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক

দ্বিতীয় একক **(পৃষ্ঠা 9 - 22)**

বুদ্ধের আর্যসত্য

তৃতীয় একক **(পৃষ্ঠা 23 - 46)**

স্বরুপ ও পরিধি

চতুর্থ একক **(পৃষ্ঠা 47 - 52)**

অধিকার এবং মানব অধিকার বৈশিষ্ট্য

প্রশ্নাবলী **(পৃষ্ঠা 53 - 54)**

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক (পৃষ্ঠা 1-8)

পরমার্থ এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 9 - 22)

বুদ্ধের আর্যসত্য

তৃতীয় একক (পৃষ্ঠা 23 - 46)

স্বরুপ ও পরিধি

চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 47 - 53)

অধিকার এবং মানব অধিকার বৈশিষ্ট্য

প্রশ্নাবলী (পৃষ্ঠা 54 - 55)

ভূমিকা

টিপ্পনী

'ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কৃতিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হল ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের সংযোজন। আমরা সকলে অল্পবিস্তর পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের সম্বন্ধে অবহিত। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের যেকটি শাখা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার নীতি বিষয়ক আলোচনা কালে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করেছেন। যে দিক দেখলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকটিকে নীতিশাস্ত্রের উপরে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ছাত্রপযোগি পুস্তক বলা যায়। এই পুস্তক ব্যাক্তিবর্গের জন্য নয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী বিষয় বস্তুকে যথাসাধ্য সহজভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রথম একক

পরমার্থ এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক

টিপ্পনী

প্রাচীন হিন্দুরা চারটি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ পুরুষার্থকে চিহ্নিত করেছিলেন : (ক) অর্থ, (খ) সুখ, (গ) সততা এবং (ঘ) মুক্তি। প্রত্যেক মানুষের উচিত তার পরিপূর্ণ কলভানের জন্য এই চারটি পুরুষার্থকে অনুসরন করে চলা। সম্বদ মানুষের বস্তুগত জৌবিক এবং অর্থনৈতিক চাহিদা মেটায়। সুখ মানুষের মানসিক এবং আবেগ চাহিদা মেটায়। কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটায়। সততা তার বুদ্ধিজাত (Rational), সামাজিক এবং নৈতিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়। শুধু তাই নয়, নৈতিক নীতি (ধর্ম) অনুযায়ী জীবন ধারনের মধ্যে সততা নিহত থাকে। সততা সহজাত প্রবৃত্তি, তীব্র কামনা (Appetiute) ভাবাবেগ(Impulses) বাসনা এবং আবেগ কে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারা নিবন্ত্রিত করে। সুখ সমৃদ্ধের চেয়ে উচ্চতর ; অবশ্যই সমৃদ্ধ থেকেই সুখের পথ প্রশস্ত হয়। সুখের চেয়ে উচ্চতর। এটা হল নৈতিক কল্যানে। আবার কেউ কেউ নৈতিক নীতিকে ঈশ্বরের আদেশ বলে মনে করে। ঈশ্বর যা নির্দেশ দেন তাই ঠিক ; তাঁর দ্বারা যা নিষিদ্ধ তা ভুল বা ভ্রান্ত। আমাদের উচিত তাঁর আদেশ অনুসরণ করা। কারণ তা করতে পারলে আমাদের পূর্ণতা আয়ত্ব করা সম্ভব হয়। নৈতিক নীতি ঐশ্বরিক বিশুদ্ধ নীতি থেকে উদ্ভব হয়। আবার কেউ কেউ নৈতিক নীতিকে অতিবর্ত্তী (Transsecndent) ঔচিত্যের পর্যায়ে ফেলেন ; এবং তা মুক্ত পুরুষের দ্বারা বুঝতে পারা যায়।

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে পুরুষার্থের ধারনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় সমস্ত বিদ্যাই পুরুষার্থের ধারনার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। পুরুষার্থ শব্দটি বলতে পুরুষের অন্বিষ্ট বা কাম্য এই অর্থ প্রকাশ করা হয়। পুরুষ যা সচেতন ভাবে অন্বেষন করে বা কামনা করেতারই নাম পুরুষার্থ। মানুষ সচেতন ভাবে তার আদর্শ স্থিত করতে পারে এবং আদর্শ রূপায়নের জন্য সাধনা করতে পারে। শব্দটি হল পুরুষ + অর্থ। অর্থ শব্দের দ্বারা এমন আদর্শ বোঝানো হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তব নয় বটে কিন্তু অনুসরণ করার যোগ্য বা বাস্তবে রূপায়নের উপযুক্ত 'অর্থ' কথাটির সঙ্গে যুক্ত বলে এখানে পুরুষের পক্ষে সচেতন সাধনার ইঙ্গিত বর্তমান। পুরুষার্থকে সাধ্য বলা হয়। সাধনা করে যা লাভ করা যায় তাই সাধ্য। পুরুষার্থ পুরুষের সাধনা লভ্য। যা সাধনা লভ্য তা মূল্যবান। এই কারণে পুরুষার্থকে মূল্যবান বলা হয়। মূল্য দ্বিবিধ - গৌন এবং মুখ্য। সম্বন্ধ আনন্দদায়ক বস্তু ক্রয়ের জন্য

প্রয়োজনীয় বলে মূল্যবান। সম্পদের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। ধনের মূল্য গৌন মূল্য কিন্তু সম্পদ যে আনন্দ দেয় তার মূল্য গৌণ নয় মুখ্য। কারণ আনন্দ আনন্দ বলেই আমাদের কাছে মূল্যবান। সুতরাং আমরা 'পুরুষার্থে' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, যে উদ্দেশ্যে বা আদর্শ মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ মূল্যবান মনে করে আমরা সচেতন ভাবে অনুসরন করি এবং সিদ্ধ করতে চেষ্টা করি তাই পুরুষার্থ।

টিপ্পনী

অনেক ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন যে পুরুষার্থ মধ্যে, কিন্তু এখনও সিদ্ধ নয়, কিন্তু এমন অনেক দার্শনিক আছেন যারা বলেন বস্তুতঃ সিদ্ধ জিনিস ও ব্যাক্তি বিশেষের কাছে সাধ্য হতে পারে। যেমন, কোনো গচ্ছিত ধন মাটির নীচে যদি থাকে, তবে মাটির আবরণ উন্মোচন করলে তা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে গচ্ছিত ধন বস্তুতই পূর্ব থেকে ছিল বলে তা সিদ্ধ তবে ব্যাক্তি বিশেষের কাছে মাটির আবরনের জন্য তাল্যভ ছিল না। যখন মাটির আবরণ অপসৃত হল তখন গচ্ছিত ধন লাভ হল। সুতরাং এই দিক থেকে বস্তুতঃ সিদ্ধ গচ্ছিত ধন ব্যাক্তি বিশেষের কাছে সাধ্যই তো বটে। সুতরাং সিদ্ধ বস্তু হতে পারে। এখানে কর্মের দ্বারা সিদ্ধ বস্তু সাধ্য হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা ও সিদ্ধ বস্তু সধ্যে হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে কোনো বাক্তি যদি গামছা কাঁধে নিয়ে সমস্ত বাড়ী গামছা খুঁজে বেড়ায় এবং কেউ যদি তাকে বলে বা নিজেই হঠাৎ উপলব্ধি করে যে গামছা তো তার কাঁধেই আছে, তবে সিদ্ধ গামছাই তার কাছে সাধ্য বলে মনে হয়। এখানে কর্মের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুই সাধ্য হয়নি, সাধ্য হয়েছে জ্ঞানের দ্বারা। তবে এখানেও সিদ্ধ বস্তুই সাধ্য হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতেপারি যে অসিদ্ধ বস্তুই শুধু সাধ্য নয়; সিদ্ধ বস্তুও সাধ্য হতে পারে এবং এই দুই প্রকার সাধ্য বস্তুই পুরুষার্থ।

প্রাচীন কাল থেকে আগেই বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে চারটি পুরুষার্থ স্বীকৃত। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ - এই চতুবর্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেচতুঃবর্গ ছাড়াও আর একটি পুরুষার্থে স্বীকার করা হয়েছে, তা হল ভক্তি। এই মতে ভক্তি যুক্তির চেয়ে বড়, ভক্তি যুক্তি গরীদর্ষী।

ভারতীয়দের মতে অর্থ ও কাম উভয়ই পুরুষার্থ; যেমন ধর্ম ও মেক্ষ - পুরুসার্থ তবে অর্থ ও কাম ধর্মের জন্যই পুরুষার্য এবং এই অর্থে অর্থ কাম গৌণ পুরাষার্থ এবং ধর্ম মুখ্য পুরুষার্থ। কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক যেমন প্রাচীন মীমাংসা এই ত্রিধর্ণা স্বীকার করেনএবং মোক্ষ বলে কোন পুরুষাকাযফ মানেন না। তবে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক জমোক্ষএবং মোক্ষকেই পুরাষার্থ বলে গ্রহণ করেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
2

'ধর্ম শব্দটি ভারতীয় চিন্তায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। আমরা ইংরেজীতে যাকে 'Religion' বলি তা ধর্ম শব্দের সমার্থক নয়। ধর্ম হল তাই যা ধারন করে। ধর্ম ভারতীয় চিন্তাধারার পুরুষার্থ হিসেবে বিবেচিত ; অতএব, তা পুরুষ বা মানুষকে ধারন করে। অনেকের মতে যার জন্য মানুষ মানুষ, তাই ধর্ম। ধর্ম শব্দের অর্থ নীতি এবং তা

নিয়ম (Law) ও বোঝায় । ঋগবেদে 'ঋত' কে ধর্ম বলাহয়েছে। 'ঋত' অমোঘ নৈতিক নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে যেমন ব্যাক্তি জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি আবার বর্হিঃবিশ্ব ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনে হয়, যা ধারন করে নীতি, নিয়ম প্রভৃতি, যে সমস্ত অর্থ 'ধর্ম' শব্দের করা হয়, তা পরস্পর অসংযুক্ত নয় বরং ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত মনে হয়। মানুষকে যা ধারণ করে তাও তো আসলে নীতি ; কারণ নীতিই তো মানুষের মনুষ্যত্বের নিয়ামক। নীতির জন্যই তো মানুষ পশু নয়। আবার নীতি তো নিয়মের মধ্যে প্রকাশিত। সুতরাং ধর্ম বলতে যদি নীতির নিয়ম বোঝান হয় তবে বোধ হয় অসংগত কিছু বলা হয় না। এই অর্থে ধর্মাচরন বলতে নীতির নিয়ম মানা বোঝাবে। কারও কারও মতে এই নিয়ম বেদ নির্দিষ্ট। বেদে যা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট তাই ধর্ম। তবে ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকরা যাকে ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন তাও ধর্ম। যেমন আমরা গার্হস্থ্য ধর্মের কথা বলি। প্রতিটি গৃহস্থকে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়। যথা দেব যজ্ঞ, দেবতার উপাসনা ও ভজনা, বেদ নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, পিত্রি যজ্ঞ - পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ, ঋষিযজ্ঞ - বেদ - উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ, নৈযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ - আনুষ ও মনুষ্যেতর জীবের সেবা, দানে হাসপাতাল, পুস্করিনী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এ সবই ধর্ম। এই ধর্মাচরণের জন্য অর্থ প্রয়োজন। সুতরাং অর্থ ও পুরুষার্থ, তবে তা ধর্মের জন্য বলে তা গৌণ পুরুষার্থ।অর্থোপার্জণ আমাদের দেশে নিন্দনীয় নয়। তবে অর্থ ধর্মোপায়ে হবে নৈতিক পথে অর্জিত হতে হবে এবং তা ধর্মের জন্যই ব্যায় করতে হবে। অন্যায় পথে অর্থের উপার্জণ এবং অন্যায় কর্মে অর্থব্যায় - দুই ই আমাদের দেশে নিন্দনীয়। ধর্মাচরনের জন্য কর্মের ও আবশ্যকতা আছে। কারণ জীব না থাকলে ধর্মাচরণ করবে কে ? আর জীব সৃষ্টির জন্য কামের প্রয়োজন সুস্পষ্ট। তবে কামের জন্য কামাচরণ আমাদের দেশে নিন্দনীয়। আমাদের দেশে স্ত্রীকে ভোগ সামগ্রী বলে মনে করা হয় না। স্ত্রী সহধর্মীনী। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী ধর্ম আচরণে সহায়তা করবেন - এটাই অভিপ্রেত। সংসার করেও আমাদের দেশে ধর্মের আচরণ রূপে পরিচিত। 'সংসার ধর্ম' কথাটি বহুল প্রচলিত।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থ, কাম আমাদের দেশে পুরুষার্থ রূপে বিবেচিত হলেও উভয়েই ধর্মের আচরণের জন্যই পুরুষার্থ এমন কথাও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অর্থ ও কাম গৌণ পুরুষার্থ এবং ধর্মই মুখ্য পুরুষার্থ। আমাদের দেশে ধর্ম বলতে সমগ্র জীবন বোঝায়। জীবন চর্যাই ধর্মাচর্যা। ধর্মই জীবনের মুখ্য ব্যাপার। তবে জীবন ধর্মের জন্যই অর্থ ও কাম প্রয়োজন বলে তারাও পুরুষার্থ।

অর্থ ও কামের সঙ্গে তুলনায় ধর্ম, মুখ্য পুরুষার্থ হলেও আমাদের দেশে সাধারণতঃ ধর্মই পরম পুরুষার্থ এমন কথা স্বীকৃত নয়। অর্থ ও কামকেই পরম পুরুষার্থ বলেছেন।প্রাচীন মতে ধর্মই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু অন্য ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মোক্ষই পরম পুরুষার্য। এবং এই দিক থেকে ধর্ম মোক্ষের জন্যই প্রয়োজনীয় বলে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পুরুষার্য। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর The Hindu View of Life গ্রন্থে ভারতীয় চিন্তায় পুরুষার্থ বলতে কী বোঝায় সেই বক্তব্য স্মরণীয় - "মোক্ষ হল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, হিন্দু ধর্মের মতে মানুষ কেবল রুচির দ্বারা বাঁচে না, তার কাজের দ্বারা নয়, উচ্চাভিলাষ অথবা ক্ষমতা আরো বহির্বিচার সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে। আত্মার প্রানের দ্বারা তার বাঁচা দরকার। মোক্ষ হল আত্মা যুক্তি। অনন্তের হৃদয়ে আত্মার পরিপূরণ।

এই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে দেখলে মোক্ষই মুখ্য পুরুষার্থ। ধর্ম মোক্ষের তুলনায় গৌণপুরুষার্থ।ভগবত গীতায় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হয়ে যিনি সর্ব কর্মফল পরিত্যাগ করে ধর্মাচারণ করে, তিনি শান্তি বা মোক্ষলাভ করেন। আরও বলা হয়েছে যে, যারা কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম বা ধর্মাচরণ করেন, তাঁরা আত্মশুদ্ধি লাভ করে মোক্ষলাভের উপযুক্ত হন।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চার্বাক এবং প্রাচীন মীমাংসক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। মোক্ষলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে মোক্ষ অভিলাষার জীবন ধর্মভিত্তিক হবে এবং ধর্মের জন্য অর্থ এবং কামেরও প্রয়োজন আছে। ভারতীয় জীবন বোধ আধ্যাত্মমূলক। আমদের ঐহিক জীবন অধ্যাত্ম জীবনের সোপান বলে ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে। আধ্যাত্ম জীবনকে বাদ দিয়ে যে ঐহিক জীবন তা আমাদের দেশে নিন্দনীয়।

সাধারণ মানুষের জন্য ভারতবর্ষে এই ভাবে পুরুষার্থের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে কেউ কেউ রুচি ও প্রবণতা অনুসারে সংসারে বীতরাগ হতে পারে। আমাদের দেশে তাঁদের সন্ন্যাসী বলাহয়। সন্ন্যাসীদের জন্য একমাত্র মোক্ষই পুরুষার্থ। তাঁদের অর্থ, কাম ও ধর্মের প্রয়োজন নেই তবে সকলের জন্য এই বিধান নয়।

যাঁরা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলেন, তাঁরা সকলেই মোক্ষ বলতে সর্ববিধ দুঃখনাশ বোঝায়। তবে বৈদন্তিক ও জৈন দার্শনিকগন মুক্ত অবস্থাকে আনন্দ ও পরিপূর্ণতার অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। সকল দার্শনিকের মতে তত্ত্ব-জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান হলে মুক্তি হয়। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কারও কারও মতে কর্ম ও ভক্তির ও প্রয়োজ্য। আবার কেউ কেউ শুদ্ধ জ্ঞানেই মুক্তি হয় এমন কথাও বলেছেন। অদ্বৈত্ব বেদান্তী বলেন মুক্ত অবস্থা নিত্য সিদ্ধ অবস্থাং কারণ আত্মা নিত্য মুক্ত। তবে নিত্য সিদ্ধ হলেও আমাদের অজ্ঞানের জন্য আমরা তা উপলব্ধি করিনা। আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না, তখন নিত্য মুক্ত আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই মতে মোক্ষলাভ সিদ্ধ বস্তুরই সাধন। তবে অ্যান্য অনেক দার্শনিকের মতে মোক্ষ অবস্থা একটি নতুন অবস্থা। বৌদ্ধ, জৈন, অদ্বৈত বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে একমাত্র বিদেহ মুক্তি বা মৃতুর পর মুক্তি স্বীকৃত। জীবন মুক্ত অবস্থায় জীব জনকল্যানে কর্মে নিযুক্ত থাকেন। নিঃস্কাম কর্মানুষ্ঠানের জন্য তার পুনরায় বন্ধনের সম্ভাবনা থাকেনা। শঙ্কর, বুদ্ধদেব প্রভৃতিকে

জীবন মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করা যায়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতীয় চিন্তায় পরমপুরুষার্থ শুধু একটি পুরুষ আদর্শ মাত্র নয় । তা বাস্তববায়িত করা সম্ভব এবং কারও মতে এই জীবনেও তা করা যায় এই বিশ্বপ্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির শুধু সহায়ক নয়। এই বিশ্বপ্রকৃতির অবস্থান পুরুষদের কৈবল্য বা যুক্তির জন্যই ভারতীয় জীবন ও মননের ক্ষেত্রে মোক্ষর স্থান অদ্বিতীয়।

টিপ্পনী

জৈন এবং বৈদান্তিক দার্শনিকেরা মোক্ষ অবস্থাকে আনন্দ ও পরিপূর্ণতার অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বৌদ্ধাচার্যের মতেই নির্বান অনন্ত আনন্দের অবস্থা । আচর্য নাগসেন গ্রীকরাজ মিলিন্দকে নির্বানের প্রকৃতি বোঝানোর জন্য বলেছেন: 'নির্বান সাগরেরমত গভীর, পর্বত শৃঙ্গের মত উচ্চ, মধুর মত মিষ্ট' । তবেএই মত অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দ্বারা সমর্থিত নয়। তাঁদের মতেনির্বাণ পূর্ণজন্ম রোধ এবং দুঃখনাশবোঝায়।

তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান থেকে মুক্তি হয়। এই জ্ঞানেরজন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগাভ্যাস প্রয়োজন। আত্মসংযম অভ্যাসে করলে তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার অর্জন করা যায়। সাধারনতভাবে বলা যায় যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ মোক্ষলাভের উপায়। তবে এই সমস্ত উপাচারের মধ্যে কোন বিবরণ নেই।

মতে মুক্তি মানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, উপনিষদে এ ব্যাপারে একটা উক্তি আছে ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মতে রূপান্তরিত হয়ে যান। শঙ্করের মতে পার্থিব জগতে অজ্ঞান জন্য হয়। অতএব যুক্তি জ্ঞানের আধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হল কর্মকান্ড এবং ভক্তি ব্যাতিরেক জ্ঞান কি পাওয়া যায় ? শঙ্করের মতেকর্মবীর এবং ভক্তি উভয়ই মিক্তি পাওয়ার ভিত তৈরী করে। কর্মকান্ড কারক (doer) এবংকাজের মধ্যে দক্ষতা বোঝায়ল কিন্তু ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় সত্তা। তাহলে ভক্তির মাধ্যমে যুক্তিএনে দেয়।

অনেকের মতে ভক্তিই মোক্ষ লাভের সহজতম উপায় । ভক্তি শব্দের ধাতুগত অর্থ সেবা। ভক্ত বলতে মোক্ষ বোঝায়। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। সবশেষে আমরা বলতে পারি সর্বকর্ম ঈশ্বরের কর্ম মনে করে সর্বকর্মফল ইশ্বরে অর্জন করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুবর্ণের সুধর্ম নিষ্ঠাগত কর্মযোগ । এই কর্মযোগই মুক্তি লাভ হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
5

চার্বাক নীতিতত্ত্ব

চার্বাকদের মতে অন্ধকার না থাকলে কী আলোর রূপ বোঝা যায়? কালোর পাশ থাকলেই আলোর ছটা খোলে।তেমনি দুঃখ আছে বলেই তো সুখের এত মাধুর্য্য। মানুষ অনেকক্ষণ অভুক্ত থাকলে তবেই অন্নের অমৃত স্বাদ পায়।তৃষ্ণার্ত না হলে

টিপ্পনী

জলের মর্ম বোঝা যায় ? বিরের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা বিচ্ছেদের পরে যে মিলন, তাই সবচেয়ে মধুর। সুতরাং দুঃখের মধ্যেই সুখ সবচেয়ে সুন্দর, সার্থক ও সবচেয়ে মধুর। সুখের জন্যই দুঃখকে আমরা গ্রহণ করব। পূর্বজন্ম নেই, পরজন্ম নেই। অতীত বিগত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এই অবস্থায় বর্তমান জীবনের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য। জীবনের পরিপূর্ণ রসস্বাদী একমাত্র পুরুষার্থ। তাই চার্বাকরাবলেন - যতকাল বাঁচবে সুখে বাঁচো ; এই দেহ একবার ধ্বংস লেআর তা ফিরে আসবে না।

চার্বাকরা যে সুখবাদ প্রচার করছিলেন তা আত্মকেন্দ্রিক স্থুল সুখবাদ এবং সম্পদ ও সুখ কে জীবনেরর চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছেন। এই আত্মগত সুখবাদের মূল বক্তব্য হল কর্মই করা উচিত। নিজের সুখলাভ করার জন্য যদি অপরের সুখ খন্ডিত বা বিঘ্নিত হয়, তবু কর্তা তার নিজ সুখ অর্জনে বীতরাগ হবেন না। তাইএই মতে সারাজীবন ধরেনিজের সর্বাধিক সুখলাভ করাই একমাত্র নৈতিককর্তব্য। মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। সে কেবল তখনই অপরের সুখ বিধান করবে যদি বিনিময়ে সে নিজসুখ আশাকরতে পারে।

গ্রীক দার্শনিক Cyrenaic দের মুখপাত্র Artiplus অত্যন্ত স্থূল ধরনের আত্মসুখবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে প্রতি মুহূর্তে তীব্রতম সুখ উপভোগ করাই নৈতিক কর্তব্য।ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা যে দেহজ সুখ উৎপন্ন হয় তা মানসিক আনন্দ থেকে অনেক বেশী তীব্র। তাই দেহজ সুখই অধিকতর কাম্য। ভারতবর্ষে চার্বাকরাও এই স্থুল, জৈব সুখ লাভের অনুজ্ঞা পালন করতে লেন এমনকি ঋণ করেও ঘি খেতে বলেন। ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সুখের অনিশহিত আশায় বর্তমানের দাবি উপেক্ষা করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। কবি ওমর খৈয়ামেও বলেছেন - নগদা যা পাও তাই লুটে নাও / ভবিষ্যতের বেজায় ফাঁক।

এই স্থুল সুখবাদের অনুজ্ঞা হল চার্বাকদের মতে "খাও দাও ফূর্তি কর - কারণ কাল তুমি নাও থাকতে পার" অমিতাচারী লম্পটে সুখ অধিক কালো স্থায়ী না হলেও, সুতীব্রঐ দেহজ সুখই পরমতম কাম্যপদার্থ। কামিনী আর কাঞ্চনই জীবনকে সার্থক করতে পারে। চার্বাক দার্শনিক পুরুষার্থগুলির মধ্যে 'অর্থ' 'কাম' কেই কাম্য বলে মনেকরেন। আর ধর্ম ওমোক্ষ কেবর্জন করেন। মাছের কাঁটাবার করতেহবে বলে মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ধানের খোসা সরিয়ে ফেলার জন্য সুন্দর ভাত খাওয়া বর্জন করাউচিত নয়। ইন্দ্রিয়ানূভূতি জাত (Sensuous) সুখ অনুসরণ করা উচিত। যদিও এই ধরনের সুখের সঙ্গে কিছু পরিমাণ কষ্টও জড়িত রয়েছে।

ভাগবত গীতা চার্বাকদের স্থুল সুখবাদী বলে অভিহিত করেছেন। এঁরা ইন্দ্রিয়ানুভুতি জাত আনন্দকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন। অসাধু উপায়ে তারা অর্থ উপার্জন করেন শুধুমাত্র এই ধরনের সুখ উপভোগ করবার জন্য। সততার উপায় হিসাব তারা অর্থ উপার্জণ করেন না। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়নুভূতিজাত সুখ

আহরণ করেন। তারামূল সুখবাদের মমর্থক। তাঁরা মোহ,ক্রোধ, প্রলোভন,অহঙ্কার সর্বোত্তম মঙ্গল হিসাবে বিবেচনা করেন।

কিন্তু কিছু চার্বাক রয়েছেন যাঁরা সমূহ সুখ এবং সততাকে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এই যুক্তি থেকে চার্বাকরা চিত্রকলা, নৃত্য, সঙ্গীত এবং চারুকলা থেকে আরও মুখকে গ্রহণ করেণ বলেই তাঁরা সুক্ষ্ম সুখবাদের সমর্থন বলে বিবেচিত হন।

চার্বাকদের মনে রাখতে হবে যে অমিতাচার কখন ও শেষ পর্যন্ত সুখময় হয় না - অশান্তির সৃষ্টি করেমাত্র।উদবেগ ও অশান্তির থেকেদুরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

মানুষের দৈহিক কামন, বাসনা যেমন স্বাভাবিক তেমনি বিচার বুদ্ধিও তো স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষের যুক্তিবাদী স্বভাব স্থূল আত্মসুখ বাদকে একদেহদর্শী বলতে বাধ্য। দৈহিক কামনাকেই কেবল প্রশ্রয় দিলে ইতর প্রণীর সঙ্গে মানুষের কোন গুণগত পার্থক্য থকে না। স্বাভাবিক কামনাবাসনার নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের মধ্যেই থাক নৈতিক জীবন।

কিন্তু আবার সব মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে হলে, নিষ্ঠার প্রয়োজন হবে। তাই নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একবার বর্জন করাযায় না। তাই আত্মগত সুখবাদ সর্বদা বর্জনীয়এমন হয়তো বলা যায়না।

চার্বাক নীতিশাস্ত্রের আগে কর্মনীতি

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ একটি বিশিষ্ট মতবাদ এবং ভারতীয়দের জীবনে এই মতবাদের প্রভাব ও অপরিসীম। কর্মবাদের মূল কথা হল : "যেমন কর্ম তেমন ফল"। কৃতকর্মের ফল নষ্ট হয় না, আবার অকৃতকর্মের ফললাভ ও হয় না। কর্মকারণ নীতি অনুসারে কোনো কর্মেই কারণ ছাড়া হয় না। কর্মবাদ অনুসারে জীবনের সুখ দুঃখ কর্মেরই ফল। কর্ম কারণ, সুখ দুঃখ তার কর্মে। সুকর্মের ফল সুখ, আর দুষ্কর্মের ফল দুঃখক। এই নিয়মের ব্যাতিক্রম।

সীমিত জীবনে সব কর্মফল পাওয়া সম্ভব নয়। সেই জন ভারতীয় দার্শনিকেরা জন্মান্তর মানেন। পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফল এই জন্মে লাভ করা যেতে পারে। আবার এই জন্মের কৃতকর্মের ফল পরজন্মে লাভ করা সম্ভব। তবে এমন কখনওই হবে না যে, কোনো কাজ করা হয়েছে অথচ তার ফল পাওয়া যায়নি। Kant বলেছেন, নৈতিক আদর্শ এক জীবনে রূপায়ন সম্ভব নয়। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সাপেক্ষ। প্রত্যেক কর্মের ফল সুনিশ্চিত, কর্মবাদ এই মত প্রকাশ করে বলে একে একটি নৈতিক মতবাদ বলা যেতে পারা যায়। এই মতানুসারে সুকর্মের ফল পুণ্য ও সুখ দুস্কর্মেদর ফলে পাপ ও দুঃখ। কর্মবাদের মধ্যে প্রথম যে বিশ্বাস নিহিত তা হল এই : পূণ্য পুরস্কৃত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

হবে এবং পাপ ও অতিরস্কৃত থেকে যেতে পারে না। এই পৃথিবীর নৈতিক নিয়ম (Moral Order) মেনে চলে- এই বিশ্বাসেও কর্মবাদের মধ্যে নিহিত। জগতের প্রতিটি বস্তু কর্মের নিয়ম মানতে বাধ্য। ধর্মের জয়ে এবং অধর্মের ক্ষয় এই নীতি বিশ্ব সংসার নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তু বিন্যাস এমন ভাবেই হয়েছে যাতেকর্মের নিয়ম অব্যাহত ও অমোঘ থাকতে পারে। দার্শনিক James এর মতে 'অধ্যাত্মবাদ বলতে এক শাশ্বত নৈতিক নিয়মের স্বীকৃতি ও আশা পোষন বোঝায়।' (Spiritualism means the affirmation of an Eternal moral order and letting loose of hope)

এই অর্থে অধ্যাত্মবাদ গ্রহণ করলে ভারতীয় কর্মবাদ অধ্যাত্মবাদ প্রকাশ করে একথা বলতে হয়।

চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই কর্মবাদ স্বীকার করেন। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে যদি কোনো কাজ করা যায় তবে সেই কর্মেই নীতির আওতায় পড়ে না।শুষ্ক বীজ থেকে অঙ্কুল জন্মায় না, তেমনি নিস্কাম কর্মের জন্য ফলভোগ নেই। ফলভোগ শুধু সকমে কর্মেরই।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, এই জন্মে খারাপ কাজ করেও একজন লোক সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করে , অথচ ধার্মিক নানা ভাবে নিগৃহীত হয়। আমাদের মনে তখন কর্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে।আসলে এই ব্যাপার কর্মবাদ আক্রমণ না করে প্রমানই করে থাকে।

কিছু কিছু ভারতীয় চিন্তাবিদ মনে করেন যে মানবীয় কাজের মূলে চারটি লক্ষ্য কাজ করে চলে যেমন অর্থ, ভোগ, ধর্ম এবং যুক্তি। এই চারটার মধ্যে চার্বাক শেষের দুটো বাদ দিয়েছে। সমস্ত সুঃখের অবসান অর্থে মুক্তি পাওয়া যায়ে একমাত্র মৃত্যুর পর এবং কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যলাভের জন্য লালায়িত হবেন না। শাস্ত্রেই একমাত্র ধর্ম ও পাপের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং এই শাস্ত্রর কর্তত্ব নিয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত গ্রহনতা আশা করা যায় না। অর্থ এবং উপভোগ একমাত্র উপভোগেই হল চরম উদ্দেশ্য ; সম্পদ নিজে নিজে কোনো লক্ষ্য নয়, উপভোগের জন্য এটা ভাল, সহায়ক।

দ্বিতীয় একক

বুদ্ধের আর্যসত্য

টিপ্পনী

বুদ্ধদেব মানুষের জীবনের দুঃখ নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিলেন এবং এই দুঃখ থেকে কী করে উক্তি পাওয়া যায় তার পথ নির্দেশ করেছিলেন। দুঃখ দুর্দশা উত্তরনের পথ নির্দেশেই বুদ্ধদেবের মুখ্য অবদান। তিনি এ ব্যাপারে তাত্ত্বিক আলোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন মানুষ যখন কাঁদে তখন তত্ত্বালোচনায় সময় নষ্ট করা অনুচিত। তিনি যে বানী প্রচার করেছিলেন তা হল দঃখ নিবৃত্তি বা নির্বানের বাণী তিনি কোনোরূপ দার্শনিক আলোচনায় মগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন না। Rhys Darids তাঁর গ্রন্থ Dialogues of Buddha" এ দশটি সমস্যার উল্লেখ করেছেন। যার সম্বন্ধে বুদ্ধদেব মনে করেন আলোচনা নিষ্ফল হতে বাধ্য। এই সমস্যা গুলো তাঁর মতে অনির্দেশ্য। সেগুলি হল : (১) জগৎ কী নিত্য ? (২) জগৎ কি অনিত্য? (৩) জগৎ কি সীমিত? (৪) জগৎ কী অসীম? (৫) আত্মা আর দেহ কী অভিন্ন? (৬) আত্মা আর দেহ কী ভিন্ন ? (৭) যিনি সত্য জেনেছেন তাঁ কী পূর্ণজন্ম হয় ? (৮) তাঁর কী পূর্ণজন্ম হয় না? (৯) তাঁর কী পূর্ণজন্ম হয় কী হয় না - উভয়েই বটে ? (১০) তাঁ কী পূর্ণজন্ম হয় এবং হয় না এমনও নয় ? এ সস্ত্যা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অযথা মতভেদ সৃষ্টি হয়। তিনি বারবার বলেছেন এসব আলোচনা পরিহার করা উচিত। দুঃখ মুক্তি বা নির্বানই আমাদেদর আদর্শ। এ আলোচনায় নির্বাণ তো মিলবেই না, আলোচনা কারী নিজ তত্ত্বের জালে আরোওআটকা পড়বে। সবচেয়ে সেতা প্রয়োজন তা হল দুঃখ নাশ। বাণ বিদ্ধ বভাক্তির বাণ উৎসরনের চেষ্টা না করে বাণের উৎস, নিমর্কাতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে তারই মত নির্বোধ।

প্রয়োজন হীন তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার করে বুদ্ধদেব মানব জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তই ও দুঃখ নিবৃত্তইর উপায় সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করার চেষ্টা করেছেন। এরা 'চত্বারি আর্যত্যযনি' (চারটি আর্যসত্য) নামে পরিচিত এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বুদ্ধদেবের সমস্ত শিক্ষাই এই চারটি সত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
9

প্রথম আর্যসত্য : দুঃখ

রোগ, জরা এবং মৃত্যুর দৃশ্য দেখে জগতের অসীম দুঃখে অধীর হয়ে পড়েছিলেন। বোধিপ্রাপতির পর তিনি উপলোব্ধি করেছিলেন সমস্ত রকম জীন ও জন্মের মূলেই দুঃখ। সেই জন্যই তিনি বলেছিলেন 'সর্বং দুঃখং" (সবই দুঃখময়)।

টিপ্পনী

Oldenbery তাঁর গ্রন্থ 'Buddha' এ বলেছিলেন জগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে বেদনার অশ্রুতে যে প্লাবন সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে সমস্ত সাগরের জলেরও কোন তুলনা হয় না। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু শোক-তাপ, আশা, আকাঙ্খা, হতাশা প্রভৃতি যা কিছু বাসনাজাত সবই দুঃখের । বুদ্ধদেবের এমন কথা শুনে অনেকে বৌদ্ধ দর্শনকে দুঃখবাদী বা নৈরাশ্যবাদী বলে নিন্দা করেছেন। মনে রাকতে হবে যে চার্বক ছাড়া সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই জাগতিক দুঃখের প্রাবল্যের উল্লেখ করেছেন । সেইজন্য সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকের বিরুদ্ধে দুঃখবাদের বা নৈরাশ্যবাদের অভিযোগ আনা হয়েছে । দুঃখ স্বীকারেরমধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব জীবনের সত্য কেই মেনে নিয়েছেন । জন্ম থেকে মত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের দুঃখের কী আর শেষ আছে ? সত্য অপ্রীয় হলেও সত্য। দুঃখ আছে বলে তেমনি দুঃখ নিবৃত্তি এবং তার উপায়ও আছে। তিনি মানুষকে দুঃখ নিবৃত্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে বুদ্ধদেব আশাবাদী। দুঃখবাদ বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম কথা কিন্তু চরম কথা নয়। মাছে কাঁটা আছে বলে মাছ কী শুধুই কাঁটা ? এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণ বলবেন যেদের দূরদৃষ্টি নেই একমাত্র তারাই জাগতিক তথাকথিত সুখ কে সুখ বলে মনে করে। যাঁদের দুরদৃষ্টি নেই একমাত্র তাঁরাই জাগতিক তথাকথিত সুখকে সুখ বলে মনে করে। এই সুখের ক্ষণ যথায়িত্ব, সুখের অবমানের পর দুঃখও নীতি এবং তজনিত অন্যান্য দুঃখজনক পরিনতি দূর দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষকে ভীত, সশ্রন্ত এবং হতাশ করে দেয়। আসলে এ সুখ, সুখ নয়, প্রদাহী সুখ, এই কারণেই এ সুখ কারুরই কাম্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়আর্যসত্য : দুঃখের কারণ

বুদ্ধদেব যেমন জগৎ ও জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকা করেছেন, এমনই তিনি দুঃখের কারণ নির্দেশ করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণকে দুঃখ - সমুদায় বলা হয় । বুদ্ধদেব কার্য কারণ সমূহ প্রসঙ্গে একটা বিশেষ মতবাদেবিশ্বাসী ছিলেন । সেই মতবাদীর নাম প্রতীত সযুৎপাদ বলা হয় । এই মতবাদের প্রেক্ষিতে দুঃখের কারণ নির্দেশ করেছেন। এই মতবাদের মূল বক্তব্য জগতের কোন কিছুই অকারণে ঘটে না, কোন কিছুর অস্তিত্ব ও শর্তহীন নয়, শর্তাধীন । অতএব আমাদের দুঃখের কারণও আছে। জরা-মরণ প্রভৃতি জীবনের দুঃখ। জন্ম না হলে এ সব দুঃভোগ হতেই পারে না। সুতরাং জন্মই এর সব দুঃখের কারণ। জন্মেরও আবার কারণ আছে। জন্মালাভের বাসনা থেকে জন্মালাভের উৎপত্তি। এই বাসনার আবার কারণ কী ? জাগতিক বস্তুর সঙ্গে সংযোগ বা উপাদান বাসনার জন্য দায়ী। জাগতিক বস্তুর সঙ্গে যদি আমাদের সংযোগ না হত তাহলে এদের প্রতি আকর্ষন আমরা অনুভব করতাম না ; ফলস্বরূপ এদের ভোগের জন্য জন্মালাভের বাসনাও আমাদের হত না । জাগতিক বস্তু সংযোগের কারণ কী ? তৃষ্ণা বা ভোগ বাসনাই এই সংযোগের জাগতিক বস্তু ভোগ করতে চাই বা এদের সম্বন্ধে আমাদের তৃষ্ণা আছে তাই বস্তুর সঙ্গে আমরা সংযুক্ত

হই। যদি আমরা আগেই এদের তৃপ্তি দানের ক্ষমতার পরিচয় না পেতাম তাহলে এদের ব্যাপারে আমাদের তৃষ্ণাই হত না। সুতরাং পূর্ববর্ত্তী ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা বেদনাই তৃষ্ণার কারণ। এই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা বেদনা আবার সম্ভব নয় যদি বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ না হয়। সুতরাং স্পর্শই বেদনার কারণ। এই স্পর্শ আবার হত না যদি ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন) না থাকত। ইন্দ্রিয় না থাকলে ইন্দ্রিয়ের সঙহগে বস্তুর স্পর্শ হবে কী করে ? ষট্ ইন্দ্রিয় কে ষড়ায়তন বলে। সুতরাং 'ষড়ায়তন' স্পর্শের কারণ। ষড়য়তন দেহ-মন-গ্রন্থী ভিন্ন সম্ভব নয়। দেহ-মন-গ্রন্থী কে নামরূপ বলেহয়। সুতরাং নামরূপ ষড়ায়নের কারণ। এই নামরূপ বা দেহ-মন-গ্রন্থীর জন্য একজন ব্যাক্তিকে অন্য ব্যাক্তি থেকেআলাদা করা যায় এই নামরূপ মানুষের প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য রূপ। এই গ্রন্থী যদি মৃত হয় অর্থাৎ যদি এর চৈতন্য বা বিজ্ঞান না থাকে তবে মাতৃগর্ভে এর বৃদ্ধি হতে পারে না। সুতরাং 'বিজ্ঞান' -ই নামরূপের কারণ। আবার মাতৃগর্ভস্থিত দেহ-মন-গ্রন্থী বা ভ্রূণের 'বিজ্ঞান' পূর্বজীবনের সংস্কারেরই ফল। আমাদের পূর্বজীবনের অতীত কর্মের পুঞ্জীভুত সংস্কারই বর্তমান জীবনের জন্য দায়ী। এই সংস্কার আবার আমাদের অজ্ঞান বা অবিদ্যা র জন্য। আমারা যদি জাগতিক অস্তিত্বের সতভ রূপ অর্থাৎ এর ক্ষণস্থায়ীত্ব, দুঃখ-দুর্দশা-বিধূরতা জানতাম তবে কর্ম করারপ্রবৃত্তি হত না, ফলে জন্মও হত না; আসলে জাগতিক অস্তিত্বের সত্যরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই আমাদের সংস্কারের মূল। সুতরাং বলা যায় অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ।

আমরা ওপরে যা বললাম তার সংক্ষিপ্তসার হল নিম্নরূপ :-

(১) জরা-মরণ জাগতিক দুঃখের কারণ।

(২) জন্ম।

(৩) ভব বা 'জন্ম বাসনা'।

(৪) ভবের কারন জাগতিক বস্তু সংযোগ। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত বলেছেন 'ভব' হল সকমে কর্ম।

(৫) উপাদানের কারণ তৃষ্ণা।

(৬) তরষ্ণার কারণ বেদনা।

(৭) বেদনার কারন স্পর্শ।

(৮) স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন।

(৯) ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ।

(১০) নামরূপবিজ্ঞান ভিন্ন সম্ভব নয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(১১) বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার। এবং

(১২)সংস্কারের কারণ অবিদ্যা।

কারণ - শৃঙ্খলের দ্বাদশটি অঙ্গের নাম দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র। বুদ্বদেব এই উপদেশ স্মরণ করে এখনও কোন কোনও ভক্ত বৌদ্ধ - ভবচক্রের প্রতীক হিসেবে চক্র ঘূর্ণনে নিজেদের নিয়োজিত করে। মালা জপ করার মতন এই চক্র ঘূর্ণন ও তাদের নিত্য প্রার্থনার অঙ্গ।

দ্বাদশ নিদান কখনও কখনও এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যার ফলে অতীত, বর্তমান এবং ভাবী জীবন কার্য কারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যা। বর্তমান জীবনকে অতীত জীবনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে বর্তমান জীবনের মাধ্যমে। দ্বাদশ নিদান নিম্নরূপ অতীত, বর্তমান ও ভাবী জীবন ব্যাপ্ত করে কারণ থেকে কার্য নির্দেশ করতে পারা যায় :

অতীত জীবন :

(১) অবিদ্যা

(২) সংস্কার

বর্তমান জীবন :

(৩) বিজ্ঞান

(৪) নামরূপ

(৫) ষড়ায়তন

(৬) স্পর্শ

(৭)বেদনা

(৮) তৃষ্ণা

(৯) উপাদান

(১০) ভব

ভারী জীবন :

(১১) জাতি

(১২) জরা-মরণ

(৩) তৃতীয় আর্যসত্য : দুঃখ নিরোধ

দুঃখের যদি কারণ থাক, তবে এই কারণ দূর করলেই দুঃখ দূর হয়ে যায়ে। বুদ্ধদেব বলেছেন - দুঃখ নিরোধ সম্ভব। দুঃখ নিরোধের আর এক নাম নির্বান। নির্বান এই জীবনেই লাভ করা যায়। সমস্ত রকমের কামনা - বাসনা কে নিয়ন্ত্রিত করে ক্লেশ বরণ করতে পারলে এবং সত্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কে দূর করতে পারলেই দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণ সম্ভব। যিনি এমনভাবে দুঃখ নিরোধ করতে পেরেছেন, তিনি মুক্ত। মুক্ত ব্যাক্তিকে পূজনীয় ব্যাক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

নির্বাণ সমস্ত রকমের কর্ম হীনতা সূচনা করে না। ধ্রুব জ্ঞান লাভের জন্য বাইরের জগৎ এবং অন্যান্য চিন্তা ভাবনা থেকে মনোযোগ প্রত্যাহার করে এই সত্য চিন্তায় ও অনুধ্যানে একান্ত ভাবে নিবিষ্ট হতে হবে। পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করার পর পূজনীয় ব্যাক্তি ধ্যানে নিমগ্ন থাকবেন তার কোনোও মানে নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা বুদ্ধদেবের জীবন বুদ্ধত্ব ও কর্ম প্রবণতায় যে কোনও বিরোধ ছিল না তা সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বুদ্ধদেব দুরকমের কর্মের কথা বলেছেন। (১) রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিবন্ধনকর্ম এবং (২) নিস্কাম কর্ম।প্রথম প্রকারের কর্মের জন্যই পূর্ণজন্ম, দ্বিতীয় প্রকার কর্মের জন্য নয়। এই দুই প্রকার কর্মের সঙ্গে বুদ্ধদেব দুই প্রকার বীজ বপপনের তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথম প্রকার কর্মের সঙ্গে সাধারণ ফলদায়ী বীজ বপন তুলনীয় এবং দ্বিতীয় প্রকার কর্মের সঙ্গে শুস্ক বন্ধা বীজ বপন। দুঃখ বেদনায় কাতর অগনিত মানুষের কথা চিন্তা করে তাঁর প্রাণ কেঁদে ছিল। তিনি ভাবছিলেন, দুঃখ - সাগর উত্তরণের জন্য যে তরণী তিনি নির্মাণ করেছেন সুদীর্ঘ সাধনা ও তপস্যায়, তা অন্যকে ব্যবহারকরতে দিতে হবে, ধ্বংস করে ফেললে চলবে না। এভাবে উপদেশ ও আচরণের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন নির্বাণ লাভ করে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করবে, এর কোনো মানে নেই বরং জীবের অসীম দুঃখে, করুণায় বিগলিত হয়ে তাদের অশ্রু মোচনের চেষ্টা করবে। বুদ্ধদেবের জীবন এবং ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে বুদ্ধদেব নির্বাণ বলতে সমস্ত রকম অস্তিত্বের নিনষ্টি বা ধ্বংস বুঝতেন না। নির্বানের বুৎপুত্তিগত অর্থ দীপ নিবে যাওয়া বা শীতল হওয়া। দীপ নিবে যাওয়া অর্থে নির্বাণ শব্দটি গ্রহণ করলে জীবন-দীপ-নির্বাণ বা ধ্বংস বোঝাতে পারে। কিন্তু শীতল হওয়া অর্থে নির্বাণ গ্রহণ করলে আমাদের ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত হবে। জীবন - জ্বালা শীতল হওয়াই নির্বাণ। জীবন - জ্বালামানেজীবনের দুঃখ। যদি তিনি তাই বুঝবেন তবে বলতে হবে মত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেননি।

নির্বাণ লাভের দুটি সুবিধা - (১) পূর্ণজন্ম রোধ এবং (২) বর্তমান জীবনের দুঃখ নাশ। যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তাঁর পূর্ণজন্ম হবে না, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আর পূর্ণজন্ম যদি না হয় তবে ভবিষ্যতে দুঃখ বেদনা লাভের কোনো আকাংখা থাকবে না একথা নিশ্চিত। নির্বাণ মানেই তো দুঃখ নিরোধ। সুতরাং যিনি নির্বাণলাভ করেছেন তাঁর এ জীবনে সকল দুঃখের অবসান হয়েছে।

বুদ্ধ পরবর্তী যুগে নাগসেন নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য বলেছেন নির্বাণ অনন্ত আনন্দের অবস্থা। কিন্তু বুদ্ধদেবের চিন্তাধারার মধ্যে একথার সুস্পষট আভাস পাওয়া যায় না। তিনি নির্বাণ বলতে দুঃখাতিত অবস্থা বুঝতেন ; কিন্তুঐ অবস্থায় আনন্দ আছে কীনা এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। নাগসেন কতকগুলি উপমা ব্যবহার করে বলেছিলেন : নির্বাণ সাগরের মত গভির,পর্বতশৃঙ্গের মত উচ্চ, মধুর মত মিষ্ট প্রভৃতি, অবশ্য নাগসেন একথাও বলেছেন অন্ধকে যেমন বর্ণ কী তা বোঝানো যায় না,তেমনি যিনি নির্বাণ লাভ করেননি তাঁকে এর প্রকৃতিও বোঝান যায়ে না। আসলে নির্বাণ ব্যাপারটা আলোচনার বিষয় নয় ; এটা উপলব্ধি ও অর্জনের ব্যাপার খ। সেইজন্য অনেকে মনে করেন নির্বাণ অনির্বচনীয় বা বর্ণনাতীত।

(৪) চতুর্থ আর্যসত্য : দুঃখ - নিরোধ মার্গ

দুঃখ নিরোধ মার্গ চতুর্থ আর্যসত্য। বুদ্ধদেব স্বয়ং যে মার্গ বা পথ অনুসরন করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এবং অন্যরাও সে পথ অনুবর্তন করে দুঃখ নিরোধ করতে পারে তাই দুঃখ নোরোধ মার্গ। তিনি এ ব্যাপারে সে পথ নির্দেশ দিয়েছেন তা আটটি ধাপ বা স্তর বিশিষ্ট। সেই জন্যই এই পথের নাম 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বুদ্ধদেবের মতে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই নৈতিক জীবনের ভিত্তি। ভিক্ষু, অভিক্ষু সকলের জন্য এই একই পথের ব্যবস্থা। আসলে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ নৈতিক নিয়মের পথ।এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরূপ :

সম্যগ্‌দৃষ্টি

সম্যগ্‌ সংকল্প,

সম্যগ্‌ বাক

সম্যক্‌কর্মান্ত

সম্মা আজীব বা সম্যাগাজীব

সম্মা বায়াম বা সম্যাগ ব্যায়াম

সম্মাসতি বা সম্যক্‌স্মৃতি এবং

সম্মা সমাধি বা সম্যক্‌ সমধি।

সম্যগ্‌দৃষ্টি :-

বুদ্ধদেবের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞান আমাদের দুর্গতির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মিথ্যা দৃষ্টি এই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা দুর করতে পারলেই দুঃখ নিরোধ সম্ভব। একমাত্র সত্য দৃষ্টি লাভ করলেই মিথ্যা দৃষ্টি দূর হতে পারে। তাই বুদ্ধদেব দুঃখ নিরোধের জন্য প্রথমে সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্যগ্‌দৃষ্টি বলতেকী বোঝান হয় ? তাঁর মতে চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ই সম্যগ্‌দৃষ্টি। এই দৃষ্টি বা জ্ঞান লাভ করলই নির্বাণের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়।

টিপ্পনী

সম্যগ্ সংকল্প -

জ্ঞান কার্যকারী হলেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়।যে লোক জ্ঞান লাভ করেছে অথচ সেই জ্ঞান অনুসারে জীবন পরিচালিত করে না, তার জ্ঞান বৃথা। এই কারণে বুদ্ধদেব মনে করতেন যে সম্যগ্‌দৃষ্টি অর্জন করলেই কিছু হবে না। এই জ্ঞানের প্রেক্ষিতে জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে ; তাকেই সম্যগ্ সংকল্প ভিন্ন অর্থহীন। এই কারণে মুমুক্ষুকে বিষয় বাসনা, হিংসা -দেষ এবং অন্যের অনিষ্ঠ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে সম্যগ্ সংকল্পে যিনি বিশ্বাসি তিনি নিশ্চয়ই এই উপদেশ পালন করবেন।

সম্যগ্‌বাক :-

সম্যগ্ সংকল্প যদি শুধু সদচ্ছিয় পরিণত হয় তবে তার তাৎপর্য থাকে না। সংকল্প কাজে পরিণত করতে হবে। সম্যগ্ সংকল্প প্রণোদিত হয়েসর্বপ্রথম আমাদের বাক্য নয়ন্ত্রিতকরতে হবে। আমরা মিথ্যা ভাষন, অপ্রিয় কথন ইত্যাদি পরিত্যাগ করব। আমরা যে চারটি আর্যসত্যের আলোকে জীবননিয়ন্ত্রিত করতে চাই তা সর্বপ্রথম হল আমাদের বাক্য নিবন্ত্রিত করে কাজে পরিণত করতে হবে।

সম্যক্ কর্মান্ড :-

সম্যাগ্‌বাক্ এ শেষ হয়ে গেলে চলবে না, বাক্য নিয়ন্ত্রণ সম্যক কর্মান্ডে পর্যবসিত হওয়া চাই। অর্থাৎ বাক্য নিবন্ত্রণ এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ উভয়েই করতে হবে। যিনি সম্যগ্ সংকল্প করেছেন তিনি যে শুধু সদালাপি হবেন তাই নয়, তাকে সদাচারীও হতে হবে। সম্যক্ কর্মান্ড বলতে অহিংসা বোঝায়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
15

সম্মা আজীব বা সম্যাগাজীব :-

সদালাপ এবং সদাচারে অভ্যস্থ হয়ে মুমুক্ষু সৎভাবে জীবিকা অর্জন করবে এই নীতির তাৎপর্য হল যে জীবন রক্ষার জন্য যুক্তিব্রতী অন্যায় উপায় অবলম্বন করবে না ; সম্যগ্ সংকল্পের আলোকে জীবন যাপন করবে। অনেকে মনে করেন উপায় যাই হোক না কেন উদ্দেশ্য মহৎ হলেই হল। বুদ্ধদেব এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না।

তাঁর মতে উপায়, উদ্দেশ্য উভয়েই সৎ হওয়া চাই।

সম্মা ব্যায়াম বা সম্যাগ্ ব্যায়াম :-

এমন ব্যাক্তি রয়েছে যাঁর সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যগ্ সংকল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কর্মান্ড ও সম্যগা জীব এর অধিকারী ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অসৎ ধারনার রক্ষাবর্ত্তী হবে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। সেই জন্যই বলা হয়েছে নৈতিক জীবনে উন্নতিকামী ব্যাক্তি মন থেকে সঞ্চিত অসৎ ধারণানির্মূল এবং নতুন অসৎ ধারনা রোধ করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করবে। মন কখনওই সম্পূর্ণ রূপে ধারনামুক্ত রাখা সম্ভব নয়। সেই জন্যই বুদ্ধদেব বলেছেন সঞ্চিত অসৎ ধারণা নির্মুল এবংনতুন অসৎ ধারনা রোধ করার চেষ্টার সঙ্গে মন সৎ চিন্তায় পরিপূর্ণ রাখার এবং এই সৎ চিন্তা মনে যাতে স্থায়ী হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এই চার প্রকার চেষ্টাই সম্যগব্যায়ামের চতুরঙ্গ। এই নীতির তাৎপর্য হল যে নৈতিক জীবনে বেশ উন্নত ব্যাক্তিও যদি প্রতি মুহূর্তে নৈতিক নিয়মের সম্বন্ধে সজাগ না থাকে তবে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। সোজা কথায় নৈতিক জীবনে অসাবধানতার কোনও অবকাশনেই। Aristotle ও মনে করতেন যে নৈতিক জীবনে অবকাশ বা ছুটির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সম্মাসতী বা সম্যক্স্থতি :-

যিনি মুক্তিকামী তাঁকে প্রতি মুহূর্তের মনে রাখতে হবে যে তিনি যর্থাথ জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি যেন এই ধরনের জ্ঞান থেকে বিচ্যুত না হন। সম্যক্স্মৃতির এই হল তাৎপর্য। মুক্তিকামী সর্বদা। মনে রাখবেন যে দেহ দেহই, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ই, মন মনই এবং এদের প্রেক্ষিতে তিনি যেন না ভাবেন" এই আমি বা 'এটা আমার" যা যেমন তাকে তেমন বলেই সর্বদা গ্রহণ করতে হবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মানসিক অবস্থা কিছুই নিত্য নয়। এদের নিত্য মনে করলেই এদের প্রতি আকর্ষন জন্মায় এবং তা ধেকেই বন্ধন ও দুঃখ। কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যেএরা সবই অনিত্য, ধ্বংসশীল, তালে এদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। ফলে বন্ধন ও দুঃখ কিছুই হবে না। এইজন্য বুদ্ধদেব সম্যক্স্মৃতির বিধানে দিয়েছিলেন।

সম্যগ্ব্যায়াম, সম্যক্স্মৃতি এবং সম্যক্সমাধি - এই তিনটি সমাধির অন্তর্ভুক্ত।

সম্মাসমাধি বা সম্যক্ সমাধি :-

সম্যক্স্মৃতি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছেন যে দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুভুতের সমাহার। নিত্য স্মৃতি ও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকলে বোঝা যায় এই দেহ কত কদর্য এবং অনিত্য। ফলে দেহের প্রতি সমস্ত আকর্ষন লুপ্ত হয়। বিষয় - বাসনা-বিরাগ লাভের জন্যই সম্যক্ স্মৃতি। পূর্বে যা বলা হল তারসবগুলোর যিনি অধিকারী তিনি আরও গভীর মনঃসংযোজনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করবেন। এই মন সংযোগের নামই সমাধি। বুদ্ধের মতে সমাধির অর্থ হল সমস্ত মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাঁর

টিপ্পনী

শিক্ষার গভীরে যাওয়ার জন্য যে গভীর অন্তদৃষ্টির প্রয়োজন তারপরিবর্ধন করা। প্রতীতসমুৎপাদ, শীলা এবং প্রজ্ঞা এই সম্বন্ধ। বুদ্ধের যে মুল শিক্ষাদান তার গভির অনুপ্রবিষ্ঠ করার অর্থই হল সমাধি। এই শব্দটা কে এইভাবে বিশ্লেষন করতে পারা যায় : দেহ - মন - ইচ্ছার সমন্বয়। সমাধির আসল লক্ষ্য হল 'আমিত্ব' ধ্ংসকরা। কী করে এটা সম্ভব ? তিনি চারটি স্তরেরকথা বলেচেন। যেগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) প্রথম স্তরে মনকে আসক্তি (Passion) আবেগ প্রভৃতির অবিশুদ্ধতা থেকে মনকে সরিয়ে দেওয়া এবং পৃথিবীতে যা কিছু লোভনীয় বস্তু আছে তা থেকেও মনকে আসক্তি যুক্তকরা। এই প্রথম স্তরে বুদ্ধের শিক্ষাদানের বভাপারে গভীর মনণ, চিন্তন ও বিচারী জ্ঞান নিইত রয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় স্তরে বিচারী জ্ঞানের সমাপ্তি এবং বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীর বিশ্বাস জন্মান। এখানে স্কুল শারিরীক সংবেদন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হতে শুরু করে।

(গ) তৃতীয় স্তরে যেটা একটা আচ্ছন্ন ভাব (Trance) সেকানে সুখ এবং মনের স্নিগ্ধতা দেখা দেয়।

(ঘ) চতুর্থস্তরে সুখ ও নেই দুঃখও নেই। এখানে রয়েছে উপেক্ষা ভাব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদাসিনতা এবং স্নিগ্ধতা।

বৌদ্ধ দর্শনের পরবর্তী পর্যায়ে আটটি স্তরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'তন্ত্র' (Tantra) গ্রন্থে অষ্টাঙ্গিক ঋদ্ধি সিদ্ধির উল্লেখ দেখতেপাওয়া যায়।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের তাৎপর্য যদি আমরাভাল করে বুজতে পারি তাহলে এই আটটি নীতির নির্গলিতার্থ হল - প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি। চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে সমস্ত রকমের সন্দেহ মুক্ত নিষ্কাম জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা। যে অস্টাঙ্গিক মার্গের কথা বুদ্ধদেব বলেছেন সেগুলিও অর্জন করতে পারলেই শীল অর্জন করে পারা যায়। চারটি আর্যসত্যে তদগত চিত্তধ্যানই সমাধি। সমাধি প্রসঙ্গে যোগ দর্শনের ব্যাখ্যা বুদ্ধদের অস্বীকার করেন না। তবে একথাও ঠিক তিনি অতিরিক্ত বৃচ্ছসাধনার পক্ষপাতি ছিলেন না। এই খানেই জৈন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আমরা পার্থক্য দেখতেপাই। সার্থক আধ্যাত্মিক জীবনকে একটি বীণার সঙ্গে তুলনা করে হয়েছে। অতিরিক্ত দৃঢ় বা অতিরিক্ত শিথিল না করেই যেমন বীণার তার থেকে সবচেয়ে সুমধুর ধ্বনি শোনা যায় তেনি অমিতাচার এবং আত্মনিগ্রহের মাঝেমাঝি পথ অনুসরণ করলেই জীবনে সার্থকতা আসে। বুদ্ধদেব স্বয়ং বারানসীতেতাঁর ধর্মাপোদেশে বলেছেন, যে লোক ধর্মজীবন যাপন করতে চায় সেঅবশ্যই আতিকায্যের দ্বিতীয় পথ হল অতিরিক্ত নিরানন্দের পথ। যিনি জ্ঞানী সুখ আর আতিশয্যের দ্বিতীয় পথ হল অতিরিক্ত নিরানন্দের পথ। যিনি জ্ঞানী তিনি দুটি পথই পরিহার করে মধ্য পথ অনুসরণ করেন ; এই পথই নির্বানেরপথ। Oldenblerg তাঁরগ্রন্থ Buddha এ এই মতই পোষন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করেছেন। এমনকী সুদৃঢ় অতীতে Aristotle নীতির ক্ষেত্রে মধ্যপথ অনুকরনের নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান ও নীতিপরপ্রের পরিপূরক। কামনা - বাসনা পরিত্যাগ করেনৈতিক জীবনযাপন না করলে লাভ করা যায় না ; আবার জ্ঞানহীন অন্ধ নৈতিক জীবন বিপর্যয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং বলেছেন একটি আর একটির দোধক ও পরিপূরক। Socrates এর এটি কথা তিনি বলেছেন ধর্মই জ্ঞান (Vir the Knowledge)।

আমরা ওপরে যা সব আলোচনা করলাম অর্থাৎ চারটি আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং নির্বাণ তা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে নির্বানই আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু। অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বলে যদি কিছু থাকে তা হল নির্বাণ। কিন্তু বহু চিন্তবিদ, মনে করেন নির্বাণ হল সদর্থক সত্তা ; অনেকটা অদ্বৈত বেদান্তে 'নির্গুন ব্রহ্মে'র সাথে তুলনীয় অথবা উপনিষদের ব্রহ্মের সাথেতুলনীয়। মিলিন্দা পাঙহা (Milinda Panha) গ্রন্থে ঋষি নাগসেন নির্বাণকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন : "নির্বাণ অতীত নয়,নির্বাণ ভবিষ্যৎ নয় আবার বর্তমানও নয়,সৃষ্টও নয়, অসৃষ্টও নয় উৎপাদন যোগ্য নয়।" (Nirvana is not past, non future, non present, non produced nor not - produced, nor producible")। চারটি আর্যসত্য এবং বুদ্ধের ধারাবাহিক বিস্তৃত শিক্ষাদান খুব সুবিধাজনক পদ্ধতি যা সত্য শ্রষ্টার মধ্যে অন্তদৃষ্টি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বোধি প্রাপ্তির পর উত্তরণের যে মই এর কথা বুদ্ধদেব বলেছেন সেটা তখন পিছনে পড়ে থাকে ; এবং গ্রন্থের ভাষা তখন ভ্রমাত্মক বলে মনে হয়।

জৈণ নীতিবিদ্যা : অনুব্রত, মহাব্রত, ত্রিরত্ন

জৈন জ্ঞানবিদ্যা (Epistrology) ও পরাবিজ্ঞানের চেয়ে জৈন নীতিশাস্ত্র ধর্মই জন সাধারণের কাছে অধিক পরিচিত। জৈন শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মনে পড়ে জৈন ধর্মের কথা। জয়ী হওয়াই জৈন দার্শনিকের আদর্শ। এই দিক থেকে মানুষের কাছে জৈন নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। জৈন দার্শনিকদের মতে সম্যক চরিত্র গঠনের জন্য জ্ঞান বিদ্যার তাত্ত্বিক আলোচনাযতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই জৈনদের মতে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান। সম্যক চরিত্র গঠন করতে আমরা চাই কেন ? সম্যক চরিত্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভ হলে জীবের যেমন বন্ধন মুক্তি হয় তেমনি পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটে।বন্ধন মুক্তি ও পূর্ণতা - প্রাপ্তি জীবনের পরম পুরুষার্থ।

ভারতীয় দর্শনে বন্ধন বলতে জীবের জন্মগ্রহণ এবং ফলে নানা রকমের দুঃখ দুর্দশা ভোগ বোঝায়। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় জীবন জগৎ সম্বন্ধে তদের নিজ নিজ ধারনাঅনুসারেবন্ধন সম্বন্ধে এই সাধারণ মত ভিন্নভিন্নভাবে ব্যাখ্যাকরেছেন।

জৈন দর্শনের দুঃখ দুর্দশা ভোগী আত্মা কে জীব বলা হয়েছে। এই জীব স্বরূপতঃ পূর্ণ। জীবের অনন্ত সম্ভাবনা ।সমস্তপ্রতিবন্ধকদূর করতে পারলেই জীব তার অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি, এবং অসীম আনন্দের পরিচয় পায়। আকাশ মেঘমুক্ত এবং কুয়াশা মুক্ত হলে যেমন সুর্য আলোয় বিশ্ব ভাসিয়ে দিতে পারে তেমনি প্রতিবন্ধক দূর হলেই জীব তার প্রচ্ছন্ন সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা ও অসীম আনন্দের সন্ধান পায়। প্রশ্ন ওঠে কোন্ সেই প্রতিবন্ধক যা জীবের অসীম জ্ঞান,অসীম শক্তি এবং অসীম আনন্দ প্রচ্ছন্ন করে রাখে ? তার স্বরূপই বা কী জৈনরা বলেন পুদগলের প্রতিবন্ধকতার জন্যই জীব তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার পরিচয় পায় না। অর্থাৎ জীবের অপূর্ণতার জন্য যে দেহ কে সে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে সেই দেহই দায়ী। দেহ পুদগল সৃষ্ট। একটি বিশেষ দেহ গঠনের জন্য বিশেষ প্রকার পুদগল বিশেষ প্রকারে বিন্নস্ত করা প্রয়োজন। দেহ গঠনে জীবের কামনা বাসনাই নিয়মকে শক্তির কাজ করে। জীব যে দেহ আকাঙ্খা করে সেই দেহ ই প্রাপ্ত হয়।কর্ম বা জীবের অতীত ইন্তা বাক্য ওকর্ম জীবেরমধ্যে এক প্রকার কামনা বাসনার সৃষ্টি করে এবং জীব এ সমস্ত কামনা - বাসনা সার্থক করতে চায়।এই কামনা - বাসনা এক বিশেষ প্রকার পুদগল জীবের প্রতি আকর্ষন করে এবং সেই পুদগল থেকেই জীবদেহের সৃষ্টি হয়। সেইজন্যই জৈন রা কামনা বাসনা যুক্ত জীবকে দেহের নিমিত্ত কারণ এবং পুদগলকে উপাদান কারণ বলে উল্লেখ করে। এইভাবে জীব যে দেহের অধিকারী হয়, তাই তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে।

আমরা পিতা মাতার কাছ থেকে যে দেহের অধিকারী হই তা আমদের পক্ষে কোনো আকস্মিক প্রাপই নয় । আমাদের প্রাক্তন কর্মই আমরা কোন বংশে জন্মাবো,কীরকম দেহের অধিকারী হব, আমাদের বর্ণ, আকার, আয়ুষ্কাল, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা প্রভৃতি কী হবে তা নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্নকর্মের দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অবস্থা নিরুপিত হয়েথাকে। যেমন, গোত্রকর্ম আমরা কোন্ বংশে জন্মাবো তা নির্ণয় করে, আয়ুকর্ম আয়ুষ্কাল নির্ণয় করে প্রভৃতি। যেকর্ম অনুরূপ ভাবে বলা হয় আমাদের জ্ঞন আচ্ছন্ন করে তার নাম জমানা-বরনীয় কর্ম, যা আমদেরদর্শন বা বিশ্বাস আবিল করে দেয়, দর্শনাবরনীয় কর্ম, যা আমাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করে তার নাম মোহনীয় কর্ম,যাআমাদের মধ্যে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির সৃষ্টি করে তার ননাম বেদনীয় বর্থ এবং এরূপ আরও অনেক প্রকার কর্মই আছে।

ক্রোধ, মান,মায়া ওলোভবন্ধনের কারণ। এদের ‘কায়ার’ বলা হয়। কারণ এরা উপস্থিত থাকলে পুদগল আত্মালগন। জীবের দ্বারা আকৃষ্ট পুদগলের প্রকৃতি ও সংখ্যা জীবের কর্মনির্ভর বলে এই পুদগলকে কর্ম পুদগল বা কেবলমাত্র কর্ম বলা হয়। কর্ম পুদগলের বিনাশ কে নির্জরা বলে। ফলে মুকতি হয়।

জৈনদের মতে জীবের ভাবই মুখ্যতঃ বন্ধনের জন্য আয়ী, এই সবের ফলেই জীবে বনিশেষপ্রভাব পুদগলের আশ্রব বা অনুপ্রবেশ ঘটে, সুতরাং ইন্তা বা ভাবেই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বন্ধনের সূত্রপাত। এই তথ্য ইন্তা করেই জৈনরা দুইপ্রকার বন্ধনের কথা বলে - (১) ভাববন্ধন বা জীবের ভাবনার বন্ধন এবষং (২) জীবের দেহের সঙ্গে সংযুক্তির বন্ধন। আমরা জৈন দর্শনের মূলবিষয় অর্থাৎ জীবের বন্ধনআলোচনা করে দেখলাম যে মানুষের মধ্যে যা ছিল শ্বাশত তা হল আত্মা। জৈন মতে আত্মা হল শআশ্বত আবার অশ্বাশত (Non-eternal) বটে। আত্মার দুঃখও নেই কষ্টওনেই। যকন এটা গৌরবের চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে দেএর সংস্পর্শে আসে তখন তার দুঃখও শুরু হয়। মানুষ বন্ধনের মধ্যে চলে যায় তবে অতিতের অসংখ্য কর্মফলের ফলে। বিশুদ্ধ আত্মা হিসেবেমানুষ অসীম জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং ত্রুটিমুক্ত নৈতিক আচরণের অধিকারী হয়। কিন্তু কাজ হল একটা প্রতীক (Sticker) এবং মানুষষের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ এবং নৈতিক আচরণ কে আচ্ছন্ন করে রাখে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হল আত্মা যখন দেহের সংস্পর্শে এসে যায় তখন আত্মা জড় বস্তুর মত কাজ করে। আত্মার আয়তন বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হয় দেহের আয়তন অনুযায়ী। এবং এই দেহের মধ্যেই আত্মা অনুপ্রবেশ করে। এই ভাবে জীব সব দিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। মানুষ বলতে এই দেহ সমন্বিত আত্মাকে (Embodied Sprit) কে বোঝান হয়। এই মানুষই জন্ম এবং মৃত্যুর অনন্ত চক্রে আবদ্ধ থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে মানুষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। এই বন্ধনের আদি নেই। মানুষ সম্বন্ধে জৈন প্রদত্ত মতবাদে দুটো বিষয়ে লক্ষ্য করার মত ব্যাপার আছে। একটা হল কর্মবাদ এবং আরেকটা হল দেহান্তর বাদ (Transmigration) কর্মের জন্য বন্ধন এবং নির্যারার মাধ্যমে বন্ধন মুক্তি এবং ধ্যান জাতীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যায়। নির্বাণ কেবলমাত্র সন্ন্যাসিরাই পেতে পারেন। অনুব্রত হল মহাব্রতর একটা হালকা উপায় (Milder way)। শ্রাবক রা এই অনুব্রতর মাধ্যমে সন্ন্যাসি হওয়ার সুযোগ পায় পরবর্ত্তী জন্ম শ্রাবক বাকোনোমতেই হিংসার পথ নিতে পারবে না।

জৈনরা পাঁচটা প্রতিজ্ঞা (Vow) র কথা বলে থাকেন। তাঁদের ভাষায় এগুলোকে ব্রত বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অপরকে আঘাত না করা সত্যবাদিতা, চুরি না করা, যৌন সংযম এবং অপ্রয়োজনীয় উপহার না গ্রহণ করা। এই পাঁচটি ছোট প্রতিজ্ঞা কে বলা হয় অনুব্রত। এদের বৃহত্তর রূপই হল মহাব্রত। এই সবগুলো থেকে আংশিক ভাবে বিরত না থেকে যখন সম্পূর্ণভাবে কেউ বিরত থাকে তখন সেই ব্যাক্তি মহাব্রতের উপাসক হয়েওঠেন।

সমস্ত জীবের মধ্যেই সমান সম্ভাবনা নিহিত। জৈনদের এই তাত্ত্বিক ধারনা থেকেই আহিংসা ব্রতের উদ্ভব। Mackerzie তাঁর Hindu Ethics গ্রন্থে বলেছেন প্রাচীন অসভ্য লোকেরা সমস্ত রকম প্রাণীকেইভয়ের চোখে দেখত, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অহিংসার সৃষ্টি ('The root idea the doctrine of Ahimsa ..... is the are with which the savage regards life in all its form'.) কথাতি সৰ্ব্বে মিথ্যা এবং অভিসন্ধি প্রসূত। যদি যে কোন জীবই, যত

সাধনার হোক না কেন অন্য জীবের মত মহৎ হতে পারে ; তবে প্রত্যেক জীবই তার জীবনের মত অন্যের জীবনের মূল্য নিশ্চয়ই স্বীকার করবে - এই ধারনার ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে জৈনদের অহিংসাব্রত।

জৈনরা বলেন জীবনের প্রত্যেকটি কাজে এই ব্রত অনুসরন করতে হবে। হিংসা করাটাই শুধু দোষের নয়, হিংসার কধা চিন্তা করা, হিংসার কথা বলেও দোষের। নিজে হিংসা করা (কৃত) অন্যকে দিয়ে হিংসা করানো (কারিত) এবং হিংসা কর্ম সমর্থন (অনুমত) সবই সমান অপরাধ। সুতরাং পরিপূর্ণ ভাবে অহিংসা ব্রত উদযাপন করতে হলে এ সমস্ত কর্ম থেকেই বিরত থাকতে হবে। অনেকে মনে করে থাকেন জৈনদের সত্য মানে সুনৃত (উপাদেয় ও উপকারী সত্য)। সত্য কথা বললে যদি অন্য লোকের জীবন হানি হয় তবে এরূপ সত্য কখনও সমর্থনীয় নয়। সত্য সর্বদাই অহিংসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

গৃহী ও সন্ন্যাসি উভয়ের জন্যই পঞ্চব্রতের বিধান। তবে গৃহী বা 'শ্রাবক' এর জন্য এর বিধান বেশ সহজ। সেই জন্যই সন্ন্যাসীদের বা শ্রমণদের ব্রত কে বলে মহাব্রত এবং গৃহীদের ব্রত কে বলা হয় অনুব্রত। অবশ্য জৈনদের মতে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যয়ক চরিত্র অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ।

জৈনরা যে অন্ধভক্তিবাদী নয়, যুক্তিবাদী তা অন্যভাবেওও বোঝাযায়।

সম্যক জ্ঞান : জৈনদর্শন সম্যকজ্ঞান বলতে জীব এবং অজীব সম্বন্ধে সংশয় ভ্রম ও অনিশ্চিয়তামুক্ত বিপদ জ্ঞান বোঝায়। কেবলজ্ঞান বা সর্বজ্ঞতাই মানুষের জীবনের আদর্শ। কর্মের প্রতিবন্ধক দূর করে কেবলজ্ঞানবা সর্বজ্ঞতা লাভ করার চেষ্টা করার দরকার আছে।

সম্যক চরিত্র : যা কিছু কল্যাণকর তা করাএবং যা কিছু ক্ষতিকর তা নাকরা সম্যক চরিত্রের মূল কথা, মর্মাক চরিত্র লাভের জন্য জৈন্যরা পঞ্চমহাব্রত উদযাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

সম্যক চরিত্রের জন্য জৈনদর্শনে পঞ্চব্রত পালন অনিবার্য হয়েউঠে : (ক) অহিংসা (খ) সত্য (গ) সত্য (গ) অন্তয় (ঘ) ব্রহ্মচর্য (ঙ) অপরিগ্রহ (ক) থেকে (খ) পর্যন্ত আলোনা আগেই হয়েছে।

বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত না হতে পারলে বন্ধন - মুক্তির কোন আশা নেই। জৈনরা বলে, গৃহীদের জন্য অজরিগ্রহ - ব্রতের বিধান ও অনেকটা যথাসাধ্য সরল। কিন্তু সন্ন্যাসীদের জন্য পদ্ধতি গ্রহ ব্রতেরবনিধানঅত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত অভ্যাসসাধ্য

ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে জৈনরা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন না। তবে এ কথা যদি রাকতে হবে যে জৈনরা ঈশ্বর না মানলেও মুক্ত, পূর্ণ ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অনন্ত চতুদীর এর অধিকারী সিদ্ধ পুরুষদের ধ্যান ও পূজার বিধান দিয়েছেন। জৈনদের যুক্তি সম্বন্ধে ধারণা হৃদয় করলে তাঁদনের সম্পর্কে ধারনা পাল্টে যায়ে । অহিংসা সফলেরধর্ম, দূর্বলেরনয়। একমাত্র বলিষ্ঠ চিত্রেই অহিংসা সম্ভব ; দুর্বলের তথাকথিত অহিংসা শব্দের অব্যবহার ; আসলে ভিরুতারই এটা দর্থ প্রকাশ।

ত্রিরত্ন

আসক্তির উন্মেষের কারণ বিশ্লেষন করতে গিয়ে জৈনরা বলেছেন যে জ্ঞানই কেবল অজ্ঞান দূর করতে পারে। সেইজন্য তাঁরা সঠিক জ্ঞান (সংযোগ জ্ঞান) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে এই সঠিক জ্ঞনই হল তত্ত্বজ্ঞান।

জৈন নীতিশাস্ত্রে সঠিক বিশ্বাস, সঠিক জ্ঞান এবং সঠিক ব্যবহার হল তিনটি রত্ন যা ভাল জীবনে প্রোজ্জ্বল থাকে। এই ত্রিরত্নের মধ্যে দিয়ে মুক্তির জন্ম প্রশস্ত হয়। মুক্তি এই ত্রিরত্নের যুগ্ম ফল।

তৃতীয় একক

স্বরুপ ও পরিধি

টিপ্পনী

নীতি বিজ্ঞানের স্বরূপ কী অর্থাৎ এর স্বরূপকে বা বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা দরকার যেটা সকলের নিকট সমান ভাবে গ্রহণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু তা ভীষনই কষ্টকর কারণ নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে থাকেন। এর ফলে হয় কী সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই বিষয়টাকে অনিউর্দিষ্টভাবে (Imdefinitely) উপলব্ধি করা হয়। সেইজন্য মনে হয় মানুষের মন নৈতিক অন্বীক্ষন (Ethical imqinry) এর বিষয়বস্তুকে কীভাবে গ্রহণ করেছে এবং এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয় যেমন ধর্মতত্ত্ব (Theology), রাষ্ট্রনীতি (Politic) এবং মনোবিজ্ঞান (Psychology) বা কীভাবে যুক্ত রয়েএ তার আলোচনা দরকার। সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে অনুসিদ্ধান্ত (Counclusion)।

এবার দেখা যাক Ethis ‘ শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হল এবং বোঝা যায়ে এর বুৎপত্তি অর্থও ভীষন বিভ্রান্তিকর। এই শব্দটা অনেকআগে আসলেথেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন চরিত্রকে বোঝানো হত। কিন্তু চরিত্রের গুণ বলতে আমরা নৈতিক উঃকর্ষ (Virtue) এবং অনৈকতা (Vice) কে বুঝিয়ে যায়। কিন্তু Aristotle এর গ্রন্থে এগুলোকে কেবলমাত্র একটা উপাদান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর মতানুযায়ী নৈতিক অন্বেসনের মূল বিষয় হল যা কিছু চূড়ান্তভাবে ভাল অথবা মানুষের পক্ষে কাঙ্খিত। মানুষ যা বুদ্ধিগ্রহণ ভাবে নির্বাচন করে বা অন্বেষন করে অবশ্যই কলোন চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মাথায় না রেখে। পরন্তু মানুষ নির্বাচন করে তার নিজের জন্য। এটাই নীতি বিজ্ঞানকে ধর্মতত্ত্ব থেকে পৃথক করে রাখে। পোচোক্ত বিষয় অনুযায়ী তার বিষয় হল চূড়ান্ত মঙ্গল (Absolute good) অথবা বিশ্বের মঙ্গল। বিশ্বের সমগ্র প্রক্রিয়া নিহিত রয়েছে এই বিশ্বকল্যাণের মধ্যে। এই জগৎ যে ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় সেই জগতের কল্যাণ হল একটা মাধ্যম (Means); কিন্তু তা কোনোভাবেই ব্যাক্তি মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে না। নীতিবিদ্যা ও ধর্মতন্ত্রের মধ্যে এই যে পার্থক্য তা কিন্তু হঠাৎ এবং বিনা পরিশ্রমে আমাদের কাছে ধরা দেয় নি, আবার এ কথাও সত্তা যে Plato র দর্শনে আমরা নীতিবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে একটা অদ্ভূত মেরুকরণ দেখতে পাই। উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোনো ভাবেই বিষয় দুটোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে বোঝায় না। মানব কল্যাণ বিশ্ব কল্যাণের সঙ্গে একাত্ম বা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টিপ্পনী

উপরে যে ভাবে নীতি বিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হল তা কিন্তু নীতিবিদ্যাকে রাষ্ট্রনীতি থেকে পৃথক তাবোঝায় না।রাষ্ট্রনীতিও মানবকল্যাণেরসঙ্গে সংযুক্ত। কারণ ল মানুষ রাষ্ট্ররই সদস্য। বস্তুত আধুনিক লেখকরা বৃহত্তর অর্থে নীতিমূলক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অন্ততঃ একটা অংশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে মনে করেন। সেটা আর কিছুই নয় রাষ্ট্র মঙ্গল এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ভালত্ব বা মন্দত্ব নির্ধারণ।

নীতিশাস্ত্র ভালোমন্দ এবং ন্যায় -অন্যায়ের বিবেচনার সঙ্গে জড়িত। নীতিশাস্ত্র মানুষের নৈতিক চেতনার জাগরন এবং উপলব্ধিতে সাহায্য করে।

নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই আলোচিত হয়ে এসেছে।

নীতিশাস্ত্রকে বৃহত্তর অর্থ ছাড়াও যদি ক্ষুদ্রতর অর্থেও যথা 'ব্যাক্তিগত নীতিশাস্ত্র" রূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখব উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। এই ব্যাক্তিগত নীতিশাস্ত্র ও মানব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত, এদের মধ্যে ব্যবধান রেখা টানা খুবই সহজ যদি আমরা নৈতিক কিংবা রাজনৈতিক ইক থেকে তা দেখি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র ছাড়া চলতে পারে না। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যেই এই ধারণা বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। Plato তাঁর 'The Republic' এবং Aristotle তাঁর 'The Polies'গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল উচ্চতর নৈতিকতার উপলব্ধি। তাঁদের মতে সমকা একটা রাজনৈতিক আদর্শের উদর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। Plato র মতে নৈতিক আদর্শ উপলব্ধি করতে হলে অবশ্যই একটা রাষ্ট্র বান করতে হবে। তাঁর গ্রন্থে যে রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তা হবে ন্যায় ও নৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। Aristotle এর মতে, মানুষের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবং একমাত্র সুরাষ্ট্রেই সুনাগরিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

মধ্যযুগেও রাষ্ট্রনীতর ওপর নীতিশাস্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাধান্যকে সুদূর প্রসারী করেছিল কিন্তু নবজাগরণের পর থেকে রাষ্ট্রনীতির ওপর নীতিশাস্ত্রের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর গ্রন্থ "The Prince" এ বলেছেন রাষ্ট্রকে কোনো নৈতিক মাণ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যায়ে না। কিছু কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন নৈতিকতা ও মূল্য বোধের বিবেচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তই বিচ্যুত করে।

তবে বর্তমান সমাজে এই ধারনাকে মোটেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। কারণ আমরা সকলেই জানি বাক্তি মানুষ হিসেবে প্রায় সকজলেই কোনো রাজনৈতিক বা নিয়ন্ত্রিত সম্প্রদায় (Governed Community) এরসভ্য। তাদের নৈতিক উৎকর্ষ মূলতঃ প্রকাশিত হয় সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য জনের সঙ্গে পারপ্পরিক মিথক্রিয়ায় এবং

তাদের অধিকাংশ ব্যক্ত সুখ এবং দুঃখ অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে উদ্ভুত সন্ন্যাসী সুলভ বিচ্ছিন্নতা (Monastic isolation) য় কল্যাণের সন্ধান আদৌ পাওয়া যায়ে না ; শুধু তাই নয় তার নিজের সম্প্রদায়ের ব্যাতিরেখে তার কল্যাণও পাওয়া যায়ে না। তারা স্বীকার করবে যে ব্যাক্তিগত নীতিশাস্ত্র এর একটা রাজনৈতিক বিভাগ রয়েছে। পক্ষান্তরে এটা একটা সর্ব্বসম্মত ধারণা যে একজন শাসকের মূল চুড়ান্ত লক্ষ্য হল তাঁর সহ নাগরিকদেরকল্যাণ সাধন করা - তা বর্তমানই হোক অথবা ভবিষ্যৎই হোক। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে কল্যাণের অন্বেষন হল রাষ্ট্রনীতির একটা মূল অংশ। আমরা যকন আমাদের চিন্তা ভাবনায় একটা ব্যাক্তি মানুষকে নৈতিক চিন্তাভাবনার প্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি তখন মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের একটা ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত দুটো বিষয় স্বতন্ত্র হলেও বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব দ্রুত গতিতে দেখা যায়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দুটি বিষয়ই পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। মনোবিজ্ঞানকে মূলতঃ মনের অধ্যায়ন হিসেবেই দেখা হয়। মনোবজ্ঞানীগণ সমাজ ও বাক্তি জীবনের সর্বত্রই মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ সূত্রাদি প্রয়োগ করেণ। মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধি সম্পন্ন জীব হলেও অনেক সময় তার বিচার বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ভাবাবেগ সহজাত প্রবৃত্তিতে ও উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। মনোবিজ্ঞানীরা তাই বিশ্লেষন করার চেষ্টা করেন কেন মানুষ এরকম আচরণ করে। আমরা মানুষের কাজে বাহ্যিক প্রভাব থেকে মানুষকে ভাল বা মন্দ - সাহসী, ন্যায় (Just), সযমী হিসেবে বিচার করে থাকি। কিন্তু এই যে বিচার তা চিন্তাশীল মানুষ মনেকরে ভ্রান্ত এবং কৃত্রিম; তাঁরা মনে করেন যে যিনি কিছু করছেন অর্থাৎ কারণ তার মানসিক অবস্থা, তার অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য এবংপ্রবণতা কোও কাজের নৈতিক উৎকর্ষেরমূলে থাকে সেইজন্য সমস্ত নৈতিক সম্প্রদায়ের একটা ব্যাপারে সম্মত হওয়া দরকার যে নৈতিক অন্বীক্ষণের মূল বিষয় মানব জীবনের মানসিক দিক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের সামাজিকও রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ নিয়ে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বসবাস করতেগিয়ে তাকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা কাজকর্ম করতে হয় যার প্রভাব সমাজের উপর বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর পড়ে। সুতরাং রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের রাজনৈতিক আচরণের পিছনে যেমন ও চিন্তা-ভাবনা কাজ করে সেটার বিশ্লেষন।

Walter Bagehot তাঁর "Physien and Politics" নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেচেন।

Medougau এর মতে রাজনৈতিক কার্যায়লী রাখার জন্য মানুষের সহজাত

টিপ্পনী

প্রবৃত্তি, অনুভূতি, চিন্তার সহায়তা আবহ্যক।

জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অনবরত প্রচারকার্য চালায়। এই কাজকে ফলপ্রসূ করতে হলে জানতে হবে জনগণের মানসিক প্রবণতা। মানুষ ব্যাক্তি হিসেবে এবং সমষ্টি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আচরণ করে। সেইজন্য ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত মনস্তএর (Individual and Group Psychology) অনুধাবন প্রয়োজনে।

টিপ্পনী

অধ্যাপক Henry Sidgwrick সঠিকভাবেবলেছেন,"বিভিন্ন ভাবে নৈতিক প্রশ্ন অনিবার্যভাবে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় ধাবিত হয়, বস্তুত আমরা বলতে পারি যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ধারণা যে মনস্তাত্ত্বিক ; সম্ভবত ছাড় হল ভাল (Good) ও 'খারাপ" (Bad) "ন্যায় (Right) বা ঠিক এবং বেঠিক (Wrong)। এসবের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব জড়িত নয়। [..... in variirs ways ethilal on we way say that all important elthilal no

ভাল এবং খারাপ, যোচিত এবং মন্দ - এদের মধ্যে যে বৈপরীত্যের কথা বলা হল তা প্রায়শঃই একাত্ম বলে মনে হয়। সাধারণ ভাবে আমরা এগুলো নিয়ে বেশী মাথা ঘামালে কিছুই যায় আসে না।

গভীর চিন্তার ফলে এটুকু বোঝা যায় যে একটা মানুষের পক্ষে যা চূড়ান্ত ভাবে ভালো তা কিন্তু সাধারণ ভাবে ভালো বলতে যা বোঝান হয় তার চেয়েও বেশী কিছু এই ভালত্বের মধ্যে থাকে ব্যাক্তি মানুষের স্বার্থ বা সুখ। সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ যদি তার কর্ত্তব্য করে যেতে পারে তাহলে তা নিশ্চয়ই তার স্বার্থ অথবা সুখ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি না যে কর্তব্য এবং স্বার্থ - এই দুটো ধারণা একাত্ম ; অথবা তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে যা বৈজ্ঞানিক ভাবে জানতে পারা যায় - এমন কোনো অণুসিদ্ধান্তে ও আমরা যেতে পারি না। আধুনিক চিন্তাবিদরা মনে করেন যে এটা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। এ ব্যাপারটা যেন অদ্ভূত ভাবে দৈবক্রমে অস্পষ্ট (Obscure)থেকে গেছে। এই ভাবে আমরা ধীরে ধীরে নীতিশাস্ত্রের আর একটা ধারণায় উপনীত হচ্ছি ; এই ধারনা অনুযায়ী এটাই ভাবা হয় যে কর্ত্তব্য অথবা যথোচিত কাজের নিয়মাবলীর সঙ্গে নীতিশাস্ত্র জড়িত রয়েছে। এটাকেই বলা হয় নৈতিক সঙ্কেত- নিয়ম (Moral code)।

এই নৈতিক সঙ্কেত - নিয়ম প্রতিটি মানুষের ওপর চূড়ান্ত ভাবে বর্তায়। শুধু তাই নয়, এটা সকলেই মানতে বাধ্য। নৈতিক দৃষ্টি কোণ থেকে কারক (Agent) এর বভাক্তিগত সুখের সঙ্গে কত্ত্ব্যের সম্পর্ক একেবারেই গৌণ ব্যাপার। এদিক থেকে দেখতে গেলে নীতিশাস্ত্রের অধ্যায়ণ ধর্মতত্তব (Thelogy) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই গভীর অনুসন্ধানের ফলে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে আইনশাস্ত্র (Jurisprudence) এর

যোগ রয়েছে। আমরা এই ধারণাকে নীতিশাস্ত্রের আধুনিক ধারণা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। প্রাচীণ মত যেটা গ্রীখ দর্শনে দেখতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই আধুনিক নীতিশাস্ত্রের তুলনামুলক আলোচনা করতে পারি। এই পুরনো মত থেকে নতুন মতে যাওয়া তা মূলতঃ খৃষ্টধর্ম এবং রোমিয় আইন শাস্ত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছে। গ্রীক দর্শনে আমরা যে নৈতিক ধ্যান ধারণা পেয়ে থাকি সেখানে আইনকে চূড়ান্ত এবং মৌলিক ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

টিপ্পনী

খ্রৃষ্টীয় গীর্জার মধ্যে ইতিহাসের প্রাচীণ পাতায় আমরা দেখতে পাই যে নৈতিকতার নিয়মাবলী মূলতঃ প্রত্যাদেশ (Rivelation) এ জানা যেত এবং প্রজ্ঞা (Reasom) র দ্বারা নয়। অতএব এটা ধর্মশাস্ত্র বিশারদদের আওতায় পড়ে যাচ্ছে যারা এই ঐশ্বরিক নিয়ম কাননের নিয়মাবলী । পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল দুটো উপাদানের সমন্বয় -একটা হল খ্রৃষ্টীয় এবং অপরা (Revelation).

নৈতিকতার আইনি (Jural) দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই নৈতিকবৃত্তই (Moral faculty) র অন্বীক্ষন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং বলাই বাহুল্য তা আধুনিক নীতিশাস্ত্রে। এই নৈতিকবৃত্তই হল বিবেক (Conscience) যা চূড়ান্তভাবে সিরোধার্য।

আমরা এতক্ষন নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে যা আলোচনা করলাম তার প্রেক্ষিতেই নিম্নলিখিত বক্তব্যে উপনীত হতে পারি - (ক) ভালোর উপাদান সমূহের অভীলীক্ষন। এই অধুসমূনবের মধ্যে থাকে (Virtue) এবং সুখ (Pleasure)। এছাড়া এই অন্বীক্ষনের মধ্যে রয়েছে কর্ত্তব্য ও নৈতিক আইন (Moral law) এর নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহ। আর রয়েছে বৃত্তি (Facuelty) র উন্মেষ।

নৈবিকতার তাত্ত্বিক স্বরূপ বা ধারণা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা ব্যাক্তির উপরে নির্ভর করে বলেই ভিন্ন ভিন্নরূপেপ্রকাশিত হয়।আর একথাও ঠিক যে অন্যান্য নৈতিকআদর্শ সব মানুষ অনুসরণ করে না। নৈতিকতা বিভিন্ন সমাজ বা বিভিন্ন ব্যাক্তি সাপেক্ষ হয়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

আবার কিছু নীতিবাগীশ রয়েছেন যারা নৈতিকতাকে সমাজ নিরপেক্ষ এক, অন্যান্য আদর্শ নীতি বলতে চান; সব সময় এবং সব দেশে এই নীতি একই হতে বাধ্য তাঁদের মতে এটাই হল আদর্শ নৈতিকতা সব জায়গায় এক অভিন্ন হওয়া উচিত। এই আদর্শ নৈতিকতা সব জায়গায় এক অভিন্ন হওয়া উচিত। আমার কাছে 'ভালো' বা শুভ তা সব মানুষের কাছে 'ভালো' বা 'শুভ' হতে হবে : নৈতিক আদর্শের এই সার্বিকতা কখনওই অস্বীকার করতে পারা যায় না। ধরা যাক কোনো একটা কাজ তোমার কাছে 'ভালো' বলে মনে হচ্ছে। তখনই আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হই। আমাদের উভয়ের মতই সত্য হতে পারে না। বিরোধের মীমাংসা তখনই সম্ভব যদি আমরা

টিপ্পনী

উভয়েই এক অনন্য আদর্শ স্বীকার করি তবেই বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। এটা স্পষ্ট ভাবে জানা কঠিন। কিন্তু তার সম্ভবনা স্বীকার করাও দরকার। তা না হলে মানুষের নৈতিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

নৈতিকতা 'সাপেক্ষ' বা 'আপেক্ষিক' নানা ভাবে ব্যক্ত করা যায়। এই মতানুসারে নানা দেশ নানা কালে মানুষের আচরণে ভালো-মন্দ বোধ ভিন্ন রকমের হয় বলেই কোনো আচরণই নিঃশর্তভাবে ভলো বা মন্দ নয়। ঐ ঔচিত্য বোধ শর্ত সাপেক্ষ। যে সমাজে এক - বিবাহ প্রথা সমাদৃত হয়, সেই সমাজের মানুষ একজন স্ত্রীর একাধিক পতি বরণ করা অত্যন্ত অন্যায় বলে ববেচিত হয়; অনুরুপ ভাবে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণও নীতিগত ভাবে 'মন্দ' বলে ভাবা হয়।

আজকের ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়ে যে গোঁড়ামী দিন দিন শিথীল হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পূর্বেকারভালো-মন্দ বোধ ভাঙনের মুখে। উপার্জনের চেষ্টায় আজকাল মেয়েদের চাকরীতে বেরোতে হয় আর কর্মস্থলে অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলা মেশা খুব অভব্য বা অশালীন বলে ভাবা হয় না। তাই যুগে যুগে একই সমাজে আগের নৈতিক মূল্যের হ্রাস হয়; আবার কিছু কিছু আদর্শের নব মূল্যায়ন হতে দেখা যায়। মুল কথা হল এক অভিন্ন নৈতিক আদর্শ বা মানদন্ডের কথা আমরা ভাবতেই পারি না। এক অনন্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য কল্যাণ বা ইষ্টের খোঁজ করা বৃথা।

বিচারী মানুষ সবদেশে ও সবকালে একরকম হয় তবে সকলের বিচার একমাত্রায় উন্নত নাও হতে পারে। অকারণে অন্যের অনিষ্ট করা বা নিষ্ঠুর ব্যবহার সবদেশেই অন্যায় বলে স্বীকার করা হয়।উরি করা যে কর্ত্তব্যের বাইরে তা সব দেশে এবং সব কালে মানায়। সব দেশেই চৌর্যবৃত্তি সামাজিক ওনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তাই সর্বজন সমাদৃত কোনো মূল্য নেই এমন বলা যায়না। তবে দুটো অনিষ্টের মধ্যে মিথ্যাভাষনের বিকল্প যদি কম অনিষ্ঠকর হয়, তাহলে মিথ্যা ভাষণ অনুমোদিত হলেও হতে পারে।

আচরনের ফল দেখে তার নৈতিক বিচার করা হয় না। মহিলাদের সাজ পোশাকের ফল ভালোমন্দ হতে পারে। তাই বলে এ বিষয়ে গ্রামীণ ও শহরের মতভেদ নৈতিক আদর্শের ভিন্নতার সূচক হতে পারে না। একথা ঠিক যে, মানুষের বিচার বুদ্ধি সব দেশে একই রকম ভাবে পরিণতি লাভ করে না। তবুও আমরা মনে করি যে, যা আমার পক্ষে মঙ্গল তা সমগ্র জাতির পক্ষেই মঙ্গল। মনে রাখতে হবে যে সার্বিকতাই নৈতিক জীবনের মূল। এই জন্য বলা হয়ে থাকে নৈতিক আদর্শ সাপেক্ষ নয়, নিরপেক্ষ।

তাছাড়া নীতি বিজ্ঞানকে আদর্শ নিষ্ঠবিজ্ঞান (Normative Science) রূপে

মনে করা হয়। নীতিবিজ্ঞানকে সুসংবদ্ধ জ্ঞান (Systimatic Knowledge) হিসেবে বিজ্ঞানরূপে বিবেচনা করা হয়। মানব আচরনের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা রাশি (Volitions) এবং তাদের উদ্দেশ্য সুসংবদ্ধ ভাবে আলোচনা করে। একটা আদর্শের প্রেক্ষিতে নিরীক্ষণ (Observation), শ্রেনীকরণ (Classiticalion) এবং ব্যাখ্যা করে থাকে এই নীতি বিজ্ঞান। দেশ কালে কেন্দ্রীভূত কোনো তথ্য বা ঘটনা হিসেবে মানব আচরণকে নীতি বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে না। মানব আচরনের ওপর এই বিজ্ঞান বিচার আরোপ করে। এই বিচার কেই বলা হয় 'মূল্য বিষয়ক অবধারন' (Value judgement) এটা তথ্য বিষয়ক অবধারন থেকে পৃথকক। যে নীতি - ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন দেশ কালে, মানুষ তার কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করে তা ঐ নৈতিক আদর্শের কম বেশি প্রতিফলন। এই জন্যই বাস্তব নীতিগুলি ভিন্ন দেশে ভিন্ন হয়। কিন্তু মানুষের চরমতম কল্যাণ বা পরম পুরুষর্থে ভিন্নহতে পারে না। আমরা এত আদর্শের কথা বলে থাকি কিন্তু চরমতম আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন আমরা কী আজ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি ? কোনো ব্যাক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নীতি মনস্ক নন। যিনি নৈতিকতার উচ্চ শিখরে বসে রয়েছেন তিনি আরও উচ্চতর শিখরে আরোহন করবার প্রয়াসী হন। এই জন্যই মানুষের নৈতিক প্রগতি কখনওই স্তব্ধ হয় না। বাস্তবে ঐ নিরপেক্ষ ন্যায় নীতি কম বেশী প্রতিফলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূ পরিগ্রহ করে থাকে।

নৈতিকতা ব্যাক্তি সাপেক্ষ বলেই এবং কোনো বিশেষ দেশ এবং কালে সীমাবদ্ধ নয় বলেই নৈতিক বিরোধের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না ; এবং ঐ বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য যুক্তি - তর্কের অবতারনার কোনো অর্থই হয় না। কোনো একটি কাজের ভালত্ব, মন্দত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে। সবকিছুর অবমান হবে যদি আমরা স্বীকার করি যে এক নিরপেক্ষ নৈতিক আদর্শ আমাদের সবাইকে মানতে হবে। আমরা এবার দেখি সেই নৈতিক আদর্শ বা নৈতিকতাকী।

নৈতিকতা কে সংজ্ঞয়িত করা খুব কঠিন ; কারণ কোনো উচ্চতর শ্রেনীর মধ্যে একে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। Locke অবশ্য একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন যে, "নৈতিকতা হোল মানব জাতি সম্বন্ধীয় যথার্থ বিজ্ঞান এবং মানবজাতি তার উপজীব্য বিষয়। ("Morality is the proper science and business of mankind in general".) Locke - প্রদত্ত সংজ্ঞা ভীষন ব্যাপক বলে মনে হয়। কারণ এই নৈতিকতার মধ্যে তিনি মানুষের সমস্ত কার্যায়লীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার Aristotle বলেছেন যে নীতি শাস্ত্রের কাজ। মানুষের অদ্ভুত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণের অন্বীক্ষণ। এই শাস্ত্রের মধ্যে এমন আচরণ নিহিত রয়েছে যা উৎকর্ষ আনতে পারে। এ সংজ্ঞাও অসম্ভব রকমের ব্যাপক।

'নৈতিকতা' শব্দটি এসেছে বলাই বাহুল্য 'নৈতিক' (Moral) থেকে যা আবার 'অনৈতিক' (Immoral) এর বিপরীত। নৈতিক শব্দটিকে সময় সময় 'ভালো'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অথবা' যথোচিত'র সমার্থক বলে মনে করা হয় । তা আবার 'খারাপ' এবং যা 'অযথেচিত' । তিনি একজন নৈতিক ব্যক্তি এই বাক্যটির অর্থ হল ব্যাক্তিটি সঠিক ভাবেই চলেন। নীতিশাস্ত্রে নৈতিক শব্দটিকে ব্যবহার করাটা সঠিক হচ্ছে না। একটা কাজকে তখনই আমরা নৈতিক বলি সেটা যখন নৈতিক বিবেচনা আওতাভুক্ত হয়। একমাত্র চেতন ঐচ্ছিক ক্রিয়াকেই নৈতিক বলতে পারা যায়। যে কাজের ভালোত্ব বা মন্দত্ব বিচার করা হব তাকেই নৈতিক ক্রিয়া বলা হয়। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি নৈতিকতা কী ? অথবা আইন, ধর্ম ইত্যাদি থেকে এর পার্থক্যই বা কোথায় ? এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু মোটেই জিজ্ঞাসা করি না কোন কাজটা নৈতিক। আমরা শুধুমাত্র নৈতিক আচরণ নিয়েই জিজ্ঞাসা করি, যে আচরণ অন্যান্য আচরণ থেকে ভিন্ন। Frankena নৈতিকতা প্রসঙ্গে Bishop Butler এর মতকেই মূলতঃ সমর্থন করেছেন ; নৈতিকতা বলতে Butler 'জীবনের নৈতিক প্রতিষ্ঠান' (The monal institution of life) কেই বুঝিয়েছেন। Frankena - র মতে নৈতিকতা হল সামাজিক নিয়ন্ত্রনের একটা অস্ত্র ; সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে অথবা নিয়ন্ত্রন করতে গিয়ে নৈতিকতা আবশ্যিক হয়ে পড়ে কিন্তু মজার ব্যাপার হল সামাজিক নিয়ন্ত্রনের অন্যান্য অস্ত্র আছে, যেমন আইন, রীতিসিদ্ধ প্রথা ইত্যাদি। নৈতিকতার উৎপত্তি হল সমাজে।

নীতি বিদ্যাতে 'ভালো-মন্দ' 'সু-কু', 'ন্যায় - অন্যায়', 'উচিত - অনুচিত' প্রভৃতি নৈতিক বিশ্লেষনগুলির স্বরূপ কী ? ভালো শব্দের অর্থ কী ? 'ন্যায় পরায়নতা' কাকে বলে ? এসব বিষয়ে গ্রীক নীতি বিদ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছিল। আজও সেই বিচার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হচ্ছে। শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা এবং পরিষ্কার করা দুই প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে কোনো তথ্যের বা ঘটনার নতুন জ্ঞান হয় না। যা ছিল অস্পষ্ট তা হল স্পষ্ট। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মানব আচরনকে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়। ভিন্ন ইন্ন সমাজে বা দেশে মানুষেরা বাস্তবিক কী বিঢ়েষ ধরনের আচরণ করতে অভ্যস্ত তার যথাযথ বিবরণ দিতে পারা যায়। এইরূপ লৌকিক দষ্টিভঙ্গী থেকে বা প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আচরণের ভালোত্ব বা মন্দত্ব বিচার করা হয় না। আমরা কোনো দেশের বা সমাজের আচরণ প্রথা কী রকম ছিল তার ঐতিহাসিক বিবরণ চেষ্টা করলে দিতে পারি। এটা সমাজ - নৃবিদ্যা (Social anthropology) -র অন্তর্গত। এই সমাজ নৃ-বিদ্যায় কোনো আচরণকে ভালো, আর কোনো আচরণকে মন্দ বলে অভিহিত করা হয় - কেন করা হয় তার বিবরণ দেওয়া থাকে না।

আর একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষের আচরণকে বর্ণনা না করে তার মূল্যায়ন করতে পারি। অর্থাৎ কোন্ আচরণটি ভালো, কোন আচরণটি খারাপ সেই বিচার করা হয়। মানুষের কাজের চরমতম আদর্শে বা সব্বাপেক্ষা মূল্যবান মাণদন্ডের জ্ঞান থাকতে হবে।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করলাম ; তার স্বরূপও দেখলাম। প্রজ্ঞা (Prudence) থেকে নৈতিকতা সম্পূর্ণ পৃথকক অবশ্য কিছু কিছু আচরণ নৈতিকতা এবং পএজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে আমরা সততা কে ফেলতে পারি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী Freud নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে 'id' বা পাশবিক সহজাত প্রবৃত্তি (Animal instinct) কে নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞা উভয়েই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে প্রজ্ঞা হল এমন একটা গুন যা অহং (Ego) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ; কিন্তু নৈতিকতা বিবেকের সঙ্গে জড়ীত। নৈতিক দর্শন বা নীতিশাস্ত্র নৈতিক পদের বিশ্লেষনে বাপৃত থাকে। আমরা দেখলাম যে মূল্যবিষয়ক অবধারনই হল নৈতিক অবধারন। নৈতিকভাবে কনো কাজ ভালো আ মন্দ হতে হলে আমাদের কাজের ধারা কীরকম হওয়া উচিত তাই বিচার করে নৈতিক অবধারন। অভ্যন্তরীন উদ্দেশ্য এবং বাহ্যিক ফলাফলের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা যায় তকন অভ্যন্তরীন উদ্দেশ্যের দ্বারা কাজটির বিচার হয়।

একথাও ঠিক যে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বাইরেও এমন অনেক জড় বস্তু যেমন ছুরি, কলম, ফলমূল ইত্যাদিকে আমরা ভালো বা মন্দ বলে থাকি ; এই বিশেষনগুলো প্রযুক্ত হলেও তারানৈতিক নয়, অনৈতিক। ইতর প্রানীদেরও নৈতিক দায়িত্ববোধ থাকে না। নৈতিক ও অনৈতিক ক্ষেত্রে 'ভালো - মন্দ' বিশেষনের অর্থ একই রকমের হয়। এই শব্দগোলে দ্ব্যর্থক নয়। বাংলা ভাষায় 'গজ' শব্দটা কখনও হাতিকে কোঝায় আবার কখনও কাপড় মাপবার একক বোঝাতে পারে। অতএব এই শব্দটি দ্ব্যর্থক। কিন্তু 'ভালো - মন্দ' বিশেষনের অর্থ নৈতিক ও অনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় না। মানুষের আচরন বা কর্ম নীতির নৈতিক ক্ষেত্রে অথবা অনৈতিক ক্ষেতর 'ভালো - মন্দ' বিশেষনের মধ্যে নিন্দা - প্রশংসা থাকে। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটাকে বোঝান যায়। একতা বাক্য নেওয়া যাক - 'সত্যকথা ভালো' - এরূপ বললে সত্য ভাষন রুপ আচরন কে প্রশংসাই করাহয় ; অনুরূপ ভাবে 'এই বইটা বেশ ভালো' - এজাতীয় বাক্যে বইটিকে সমাজের করা হয়। একই ভাবে 'মন্দ' বিশেষন নৈতিক - অনৈতিক সব ক্ষেত্রেই নিন্দা বা অনাদর প্রকাশ করে। অবোধ শিশু ও বন্যপ্রানীর কাজ নৈতিক অর্থে নিন্দাও করা হয় না, আবার প্রশংসাও করা হয় না। কারণ এদের কোনো দায়িত্ব বোধ নেই।

এবার দেখা যাক্ 'দায়িত্ব' শব্দটির অর্থ কী ? আমরা যখন মনে মনে ভাবি একটা বিশেষ আচরণ আমার করা উচিত ; করনীয় বা কর্ত্তব্য, তাহলে ঐ কর্ম সম্পাদনে আমরা নিজেদের 'দায়বদ্ধ' বলে মনে করি। কোনো কাজ করতে কোনো বিচার - বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যাক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার অন্যথা করা তার পক্ষে সম্ভব হলেও তার বিচার বা বিবেক তা অনুমোদন করে না - তার নৈতিক বিচার -বুদ্ধি তাকে ঐ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইতর প্রাণীদের বিচার - বুদ্ধি নেই; সেই জন্য তাদের কোনো কর্মেই দায়িত্ব বোধ থাকে না। যে কাজ করতে আমরা ভেতর থেকে 'দায়বদ্ধ'

টিপ্পনী

বলে অনুভব করি তাই আমাদের কর্ত্তব্য।

'ইচ্ছা' বা 'অনৈচ্ছাই' যথাক্রমে কর্ম করার বা না করার কারন নয় - চেষ্টারও প্রয়োজন য়েছে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে একতা নৈতিক তত্ত্ব কিছুতেই গঠন করতে পারা যায়ে না যতক্ষন না সাধারণ মানুষের মধ্যে নিহিত নৈতিক ধ্যান - ধারনা সম্বন্ধে যে অসঙ্গতি রয়েছে তা দুর করা হয়। এটার যতক্ষন না সমাধান হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত দার্শনিকের নৈতিক উপদেশ গুলো সাধারণ মানুষের কাছে কার্যকরী হবে না। এই উদ্দেশ্যে অনুশীলনের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক প্রজ্ঞার দরকার। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমরা Socrales এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মধ্যে আমরা আচরণে স্থায়ী অনুরাগ এবং জ্ঞানের প্রতি তীব্র বাসনা দেখতে পাই।

টিপ্পনী

এ ব্যাপারে Sulgurick এর বক্তব্য স্মরনীয়। তিনি মনে করেন ভালো আচরণ সম্বন্ধীয় যুক্তিসম্মত (reasoned) মতবাদের প্রতি চাহিদা Socrates এর চিন্তা ভাবনার একমাত্র ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তবে এ কথা ঠিক উচ্চমানের প্রজ্ঞার প্রতি তাঁর জ্ঞান অতীব উচ্চ।

এতক্ষন পর্যন্ত্য নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ বা আলোচনা বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম নীতি বিজ্ঞানীরা যখন 'ভালো', 'মন্দ', 'উচিত', 'অনুচিত'প্রভৃতি শব্দের লক্ষণ বা অর্থ বলতে চেষ্টা করেন। তখন সেই লক্ষণ এমন বাক্যে প্রকাশিত হয় যা অধিনৈতিক বাক্যরূপে পরিচিত। নীতিশাস্ত্র বিচার করা নৈতিক শব্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতেগিয়ে অধিনৈতিক বাক্য ব্যবহার করেন।

আমরা এখনওও পর্য্যন্ত ধারণার পর্বতে ঘোরাঘুরি করছি। বুঝতে পারছি না ঠিক কী নৈতিক জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরে। তবে এটা বুঝতে হবে যে নৈতিক জীবন হল ক্রমিক বিকাশের প্রক্রিয়া। আমরা এই নৈতিক বিকাশের স্বরূপ তখনই সঠিকভাবে বুঝতে পারবো যদি আমরা কোন নৈতিক সংস্কারের সংস্পর্শে আসতে পারি। যদিবর্তমান যুগের বাণিজ্যিক নৈতিকতার দিকেফিরে তাকাই এবং তার সঙ্গে আদিম যুগের মানুষের রিতি - নীতি মিশিয়ে ফেলি তাহলে আমরা আদৌ বুঝতে পারব না আমরা এগিয়েছি কিনা বা পিছিয়ে পরেছি কিনা। হয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হবে আমাদের ক্রিয়া - কলাপ যুক্তি প্রান এবং বৃহত্তর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হবে আবা মানুষের চেবে আমরা বেশি স্বার্থের এবং অসাধু হয়ে উঠেছি।

আমরা যখন মানুষের কার্যায়লী থেকে নীতি (Principle) -র প্রশ্নে যাই, সে নীতি অনুযায়ী মানুষ কাজগুলো করে থাকে তখনই কর্ত্তব্য এবং সততার বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী (Codes) এর ধারণা আমাদের মধ্যে উদয় হয় যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে

পারি যে আমাদের প্রগতি হয়েছে। এর থেকে মনে হয় নৈতিকতার প্রশ্নাবলীর মধ্যে অন্যতম হল কর্ত্তব্য এবং সততা বিধিবদ্ধ নিয়ম ; তারই নৈতিকতার স্তম্ভ। কিন্তু প্রশ্ন হল - আমাদের মধ্যে কজন আছেন যাঁরা এগুলো গ্রাহ্য করেন ? খুব কম লোক আছেন যাঁরা এগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করেন। নৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে ব্যাক্তির সঙ্গে কর্ত্তব্যের সম্পর্ককে গৌণ বলেমনে করা হয়।

আমরা নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ এবং প্রাচীন গ্রীক মতবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েচে। আধুনিক মতবাদ অনুযায়ি নৈতিক মত নৈতিক সার সংগ্রহ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আইনগত নিয়মাবলী। কিন্তু প্রাচীন মতবাদে আইনী প্রশ্নটা এত উজ্জ্বল ছিল না। কালক্রমে নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ বা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হতে লাগল আধুনিক নীতিশাস্ত্রে নৈতিক বৃত্তির প্রাধান্যের মূলে রয়েছে নৈতিকতা সম্বন্ধীয় আইনীমত। নৈতিক বৃত্তি যখন বিবেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে তখন নৈতিক বৃত্তির ব্যাক্তির কাছে তা অবশ্য পালনীয় হয়ে ওঠে।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু স্পষ্টতঃই নৈতিকতা এবং এটা মানব কল্যানের মধ্যে নিহিত উপাদানের অধীক্ষণে ব্যস্ত থাকে। কী কী নীতির ভিত্তিতে আমরা একটা কাজকে ভালো বা মন্দ বলে চিহ্নিত করি ? কত্তফব্য বলতে আমরা কী বুঝি ? নৈতিক বৃত্তিই বা কী ? - এই সব প্রশ্ন নিয়ে নীতিশাস্ত্র সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধঃপতনের গভিরতা আধুনিক জীবনে অনুভূত হয়। নৈতিকতার বিচার্য বিষয় আপাতঃদৃষ্টিতে নানাবিধ।

আমরা জানি যে সামাজিক বা নৈতিক বিশ্বের মধ্যে ব্যাক্তির নৈতিক জীবন বাহিত হয় ; এই বিশ্বের মধ্যে থাকে বিবিধ উপাদান। এর মধ্যে বিরাজ করে নৈতিক আদর্শ যা সমাজের দ্বারা স্বীকৃত ; এই আদর্শ আবার আচরনের বিধিবদ্ধ নিয়ম এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক বিধিনিষেধ আর থাকে আদর্শ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

যখন প্রচলিত নিয়ম কানুনের সঙ্গে প্রতিযোজনের বাধা হয় তখনই আমরা নূতন আদর্শের জন্য লালায়িত হই। আমরা নৈতিকতার বিচার্য্য বিষয় যতই অনুসন্ধান করি, ততই আমরা ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্তিত এবং পরিবর্তনীয় প্রতিন্যাস এবং ধারনা দেখতে পাই। প্রচলিত নৈতিক ধারণা এবং আচরণের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট ভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ব্যাক্তি মানুষের জীবনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যাপক সামাজিক সমগ্রতার অপরিমেয় কল্যাণের কাছে নিজের মঙ্গলকে, নিজের কল্যাণকে অধীনস্ত করবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকেন না। মূল কথা হল, প্রত্যেকের নৈতিকতা অপরের নৈতিকতার সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যপূর্ন হয়।

যদি বাস্তবিক পক্ষে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে হয় তখন তার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কাজ হবে নৈতিকতা সম্বন্ধীয় যত কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপায়ও রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা। নির্দিষ্ট নৈতিক মান বা মূল্যের বর্ণনা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বহু আগে ১৯৮৯ সালে Samuel Alexander এই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ "Moral Order and Progress" - এ সুসংবদ্ধ জীবনের নৈতিক উদ্‌যাপনের বর্ণনার কওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । এটার জন্য প্রবৌজন বিভিন্ন জাতেরনৈতিক অবধারন সম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান থাকা দরকার এবং সেই নৈতিক অবধারন পরিব্যপ্ত থাকবে বিভিন্ন সময় এবং স্থানে। এই প্রচেষ্টা মনে হয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়ে কারণ নিত্য নতুন গুণাবলী সম্পৃক্ত হয়ে যায়ে সমগ্র এককের সঙ্গে। আলোচনার এই দিকটা আমরা এই লে শেষ করতে পারি যে নৈতিক দর্শন অভিজ্ঞতার সমগ্রতাব নীতির কী স্থান রয়েছে সেই সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে নিহিত থাকবে।

নীতি শাস্ত্রের স্বরুপকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে আমরা দু-একটা বাক্য উদাহরণ স্বরূপ আমাদের সামনে রাখতে পারি । যেম, "পরের উপকার করা ভালো","কথা দিলে কথা রাখাউচিত", "চুরি করা মন্দ" - এই বর্ণনা মূলক নৈতিক বাক্যগুলো সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে। আমরা এখানে যেন বলতে চাইছি যে পরের উপকার করা কাজটির মধ্যে 'ভালোত্ব' ধর্ম আছে। আমরা যখন বলি 'আমটি বেশ মিষ্টি' তখন এই বাক্যে বিশেষ আমটিরবর্ণনা দেওয়া হয় আর সত্য সত্যই বাস্তবে যদি খেয়ে বোঝা যায় আমটি মিষ্টি তাহলে বর্ণনাটি সতভ হয়। সদয় ব্যায়হারকে যদি মন্দবলা হয় তাহলে ঐ নৈতিক বাক্য মিথ্যা হয়ে যায়ে। টেবিলটি গোলাকার - এটা আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বুঝতে পারি। এই বর্ণনাটি প্রত্যক্ষ যাচাই যোগ্য হয়। কিন্তু এভাবে কী আমরা কাজের ভালোত্ব বুঝতে পারি ? নিশ্চয়ই নয়। নৈতিক বাক্য প্রত্যক্ষে যাচাই না হলেও তার কিছউ জ্ঞানদায়ি অর্থ থাকতে পারে। যেমন, সুবোধের কতকগুলি গুণধর্মের বর্ণনা থাকে এই নৈতিক বাক্যে যথা "সুবোধ বড় ভালো ছেলে" এর দ্বারা আমরা বলতে চাই সুবোধ নিয়মিত লেখাপড়া করে, কাউকে গালি দেয় না, বাবা মাকে মান্য করে, উরুজনদের শ্রদ্ধা করে ইত্যাদি। এইভাবে অনৈতিক ক্ষেত্রেও যখন কোনো পরীক্ষার উত্তরপত্র কে "উত্তম" বা "মোটামুটিই ভালো" বলিতখন ঐ উত্তর পত্রের কোনো গুণ বা দোষের ইত্তিতেই ঐ বিশেষন প্রয়োগ করাহয়ে থাকে ; নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছাড়া হয় না। আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে ' ভালো' এই শব্দটির মাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ভালো ছুরি, ভালো কাপড়, ভালো দাবুড়ুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণধর্ম বিভিন্ন রকমের হবে। আমরা এখানে 'ভালো' শব্দটা বিভিন্ন শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত করলেও শব্দটার অর্থ কিন্তু ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে। ছুরি ভালো বলতে আমরা বুঝি ছুরিটি ধারলো। কাপড় ভালো বলতে আমরা বুঝি কাপড়টি নরম, মোলায়েম ইত্যাদি।

নৈতিক বাক্যের কোনো সত্যমূল্য (ruth Value) নেই ।'ভালো' এই

শব্দটার সরাসরি অর্থ অভিন্ন। নৈতিক - অনৈতিক সবক্ষেত্রেই ঐ শব্দটা বা বিশেষনের দ্বারা সমাদর ও প্রশংসা সূচিত হয়। তাই নৈতিক ভাষা প্রয়োগ করে একই সঙহগে নানারূপকাজ করা হয়ে থাকে - যেমন, পরোক্ষ বর্ণনা দেওয়া হয়, সমাদর - অনাদর করা হয়, অনুকুলল - প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি কোনো কিছু নিছক বর্ণনা করতে চাই তাহলে 'ভালো-মন্দ' বিশষণের ব্যবআর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। 'ভালো' ও সুন্দর বিশেষনগুলি সকলেই প্রশংসা করে ঠিকই কিন্তু এরা সমাথফক নয়।

'ভালো ও মন্দ' আলোচনা করতে গিয়ে আমরা মূল্যায়নে এসে লৌঁছই। আমাদের জাগ্রত জীবনে প্রায়শঃই বলে থাকি, "এখন এই কাজটা করার চেয়ে ঐ কাজটা করা ভালো"। এইভাবে একাধিক বিকল্প কাজের মধ্যে 'ভালো' বা বেশী ভালো' বলে একটিকে বেছে নেওয়া হয়। কোনো একসময়ে কঠিন দার্শনিক গ্রন্থ পড়ার চেয়ে হালকে উপন্যাস পড়া নির্বাচন করতে পারি। যে কাজকে 'ভালো'বলি তাকে একাধিক বিকল্প কাজের মধ্যে বেছে নিই ; আর জানিযে আমার অনুকুল মনোভাব আছে। কোনো কিছুর প্রতি এরকমের অনুকূল মনোভাব পোষ করা, তাকে অনুমোদন করা ও তাকে নির্বাচন করাই হল মূল্যায়ন। যাহাই মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হয় তাকেই বেছে নেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে J.O. Armson বলেন যে "ভালো-মন্দ" বিশেষনের দ্বারা কোনো কর্ম ও বস্তুর মূল্যায়ন হয় ; ঐ বিশেষণ গুলি যথাক্রমে অনুমোদন - গ্রহণ - বর্জন কে সাহায্য করে।

কেন আমরা কোনো কর্ম বা বস্তুর মূল্যয়ায়ন করে থাকি? উদ্দেশ্য হল ঐ কর্ম বা বস্তুকে 'হেয়' অথবা 'উপাদেয়' বলে জানা। এই 'হেয়জ্ঞান' বা উপাদেয়ত্ব' র্ক বা বস্তুর কোনো নিজস্ব ধর্ম নয়। আমি মনে করছি ঐ কর্ম বা বস্তুকে হেয় করা যায় বা ঐ কর্ম বা বস্তুকে আমি উপাদেয় বলে মনে করছি বলেই সেই কর্ম বা বস্তুতে ঐ ধর্ম থাকে। যে বস্তু আমার কাছে উপাদেয় তা অপরের কাছে নাও হতে পারে। দর্শনের কোনো বই আমার কাছে উপাদেয় হলেও অশিক্ষিত শ্রমিকের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই। এই জন্য মূল্যের জ্ঞান বস্তু বা কর্মের নিজস্ব ধর্মের জ্ঞান নয়। যাকে হেয় বলে জানি তাকে আমরা বর্জন করি আর যাকে উপাদেয় বলে জানি তাকে গ্রহণ করি, সমাদর করি। বস্তু বা কর্মের স্বয়ং জ্ঞান দেয় না বলে এই বাক্যর সত্যমূল্য থাকে না।

নৈতিক মূল্যায়ন কোন ব্যাক্তিগত আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন রকমের হতে পারে। তবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে নীতিবিজ্ঞান এক অনন্য সর্বসম্মত আদর্শের ভিত্তিতে অনন্য মূল্যায়ন হয়, যা সকলেরকাছেই একরকমের। এখন কথা হল - নৈতিক মূল্যায়ন ব্যাক্তিগত না বিষয়গত। এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন।

বিশেষনের মাধ্যমে কাজেদরমূল্যায়ন করা হয় যেমন, কাজটি ভালো হলে তাকেমূল্যান বলে মনে করি, আবার কাজটা মন্দ হলে তাকে মূল্যহীন বলি। অধ্যাপক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

Armson যে ধরনের স্তর বিনাসের কথা বলেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় না কী সন্দেহ। 'খুব ভালো' কাজের চেয়ে 'আরও ভালো' কাজ মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে এখানে স্তর বিন্যাসের প্রশ্ন উঠছে কোথায় ? Armson নিজেই বলেছেন যে উচিত ও অনুচিতের কোনো স্তর ভেদ নেই। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উচ্চগ্রাম ও নিম্ন গ্রামের স্তরভেদ স্বীকার করে নিলেও তাদের মূল্যভেদ করা হয় না।

আর একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে এবার আমরা দৃষ্টিপাত করছি : অধ্যাপক Stevenson - এর মত অধ্যাপক Noel Smith ওবলেছেন যে ভালো, শুভ, কল্যাণকর এই সব শব্দের মাধ্যমে একটা বিশেষ কাজের প্রতি আমাদের অনুকূল মনোভাব প্রকাশ হয়। আবার 'মন্দ', 'অশুভ', 'অকল্যাণকর' এই সব শব্দের মাধ্যমে প্রতিকূল মনোভাবের প্রকাশ পায়। অনেক সময় আমরা বলে থাকি কাজটি খুব কঠিন ; এইটা বলার সাথে সাথে আমাদের প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ পেলেই তাকে উচিত বা ভালো আমরা বলতে পারি।

E. More - এ মতে 'ভালত্ব' একটা সরল গুন বা বৈষ্ট্য। আচরণের ভালত্ব সাধারণত্ব বর্ণনা করা হয়। এই নৈতিক গুণটি অনন্য ও অবিভাজ্য গুণ। তিনি আরোও মনে করেন যে আচরণের ভালোত্ব বা মন্দত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ল তবে একথাও বলা হয়ে থাকে যে এই গুণ কে সাক্ষাত ভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায়। আমাদের 'বিবেক' বা নৈতিক বোধ আচরণের ভালত্ব কে উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধি যেন অনেকটা স্বজ্ঞা (Intution) লব্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রতীতি।

বলাই বাহুল্য মানুষ দোষে গুণে জড়িত রয়েছে ; পরিপূর্ণ ভাবে কখনই মানুষ নৈইক আদর্শের বাস্তব রূপায়নে সমর্থ হয় না। অনেকক সময় দেখা গেছে যে 'মন্দ' উপায় ছাড়া সৎ উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। শতবার বুঝিয়েও যখন সন্তানকে অধঃপতনের পথ থেকে দুরে সরানো গেল না, তখন লাঠির প্রয়োগ করতে হয়। সৎ উদ্দ্যেশের জন্য 'ভালো'বা মন্দ' গ্রহণ করা সমর্থন করা যায়। নৈতিক জীবনে সৎ উদ্দেশ্যের জন্য সৎ উপায়েই শ্রেয়।

Moore তাঁর গ্রন্থে নীতি শাস্ত্রের মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুরনো স্বজ্ঞাবাদী দের ন্যায় Mortinean নৈতিক উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভাল মন্দের ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। Sidgurek লক্ষ্য তা উদ্দেশ্য কে কেন্দ্রীয় ধারণা করেছেন ; এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই আচরণের ভালত্ব বা মন্দত্ববিচার করা হয়। এই উদ্দেশ্যকে সুখের মাধ্যমেই বোঝার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই মতকে পরিত্যাগ করেছে মনস্তাত্ত্বিক অয়ীক্ষন এবং নৈতিক অবধারণের বিশ্লেষন। ভাল যদি সুখ না হয় তাহলে এর স্বরূপ কী ? নীতি শাস্ত্রের যেমূল প্রশ্ন ভাল কী ? তা জানতে গেলে অধিবিদ্যাকে অন্বীক্ষণের কোন প্রশ্নই উঠে না।

নৈতিক অবধারণের ক্ষেত্রে Moore দুও প্রশ্নের অবতারনা করেন : অবধারস্টির অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে সর্বোত্তমের এটা একটা মাধ্যম।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে নীতিশাস্ত্রের মূল বিষয় হল অভ্যন্তরীণ মূল্য অর্থাৎ যেটা নিজেই ভাল। আর এর ওপর নির্ভর করে রয়েছে বাহ্যিক মূল্য। শেষোক্ত প্রথমোক্তের উপায়। এ প্রসঙ্গে Mill বলেছেন যে ' চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের প্রশ্নাবলী সাক্ষাৎ প্রমাণ গ্রাহ্য নয়'। তত্রাচ তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং করতে গিয়ে 'কাম্য" এবং কামনা করা হয় এ দুটোর মধ্যে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্বীক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারিযে সুখ কামনার একমাত্র বিষয় হতে পারে না। ভাল এবং মন্দ বহু বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় অভ্যন্তরীণ ভালর বৈচিত্র্য রয়েছে এবং অসংখ্য অমঙ্গও রয়েছে।

অধ্যাপক Stevenson এ মত অধ্যাপক Noel Smith ও মনে করেন যে 'ভাল', 'শুভ','কল্যানকর' প্রভৃতি বিশষনের দ্বারা বিশেষ কর্মের প্রতি আমাদের এক অনুকূল মনোভাবের প্রকাশ পায় ; মনে হয় আমরা যেন কাজটি কে পচ্ছন্দ করছি। আর 'মন্দ', 'অশুভ', 'অকল্যাণকর' বিশেষনের মাধ্যমে প্রতিকূল মনোভাব থাকলেও নৈতিকক্ষেত্রে বিচার করে যদি দেখা যায় কাজটি ভাল তাহলে কেন আমি সার্থক বিশেষন প্রয়োগ করব না। অনেক সময় কঠোর কর্ত্তব্য উচিত বা ভাল বলে মনে হতে পারে।

সাক্ষাৎ জ্ঞানবাদীদের কথা না স্বীকার করেও বলা যায় যে নৈতিক বাক্যে কোনো আচরণ বা মানুষের সাক্ষাৎ ভাবে যে জ্ঞান হয় তা মানুষের কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণধর্মের ভিত্তিতেই হয়। এই গুণ ও দোষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কোনো মানুষকে কোনো বিষয়ে ভাল বা মন্দ বলে র্ণনা করতে গেলে কিছূ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা দোষের ভিত্তিতেই তা করতে হয়। অকারণে কোনো আচরণ বা মানুষকে ভাল বা মন্দ বলা যায় না। Hare এর মতে নৈতিক বাক্যে বর্ণনা ও মূল্যায়ন উভয়েই হয়। G.E. Moore, Sidgwick প্রমুখ নীতিশাস্ত্র বিশারদগন নীতিত্ত্বে 'অপ্রাকৃত - বাদ' প্রচার করেন। এরমূল কথা হল ভাল্ব একটি অখন্ড মোলিক ধর্ম যার কোনো সংজ্ঞা রচনা করা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে ভালত্ব অসজ্ঞেয়। তাঁদের মতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নীতিবিদ্যার ইতিহাসে ভালত্বের যে যে সংজ্ঞা রচনা করা হয়েছে তারা সকলেই 'প্রাকৃত' দোষে দুষ্ট। আমরা ইচ্ছা করলেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে পীত বর্ণকে দেখিয়ে দিতে পার ; কিন্তু পীত শব্দের কোনো সংজ্ঞা নেই। অখন্ড পীত বর্ণকে যেমন, চাক্ষুস প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় ল তেমনি স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা জলত্বকে বুঝতে পারি।

আধুনিক দার্শনিকেরা বলেন যে যখন আমরা কোনো কিছুকে 'ভাল' বা 'উচিত' বলি, তখন ঐ কথার সমর্থনে যে যুক্তি উপস্থিত করি তা কেবল অপরকে, যে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কোনো উপায়ে সম্মত করানোর যুক্তি নয়, এগুলি বৈধ তাত্ত্বিক যুক্তি আরতাই নৈতিকবাক্য এক অর্থে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। মানুষের কোনো আকাঙ্খা পূরণ করে এমন কোনো কিছুকে সন্তোষজনক বা মূল্যবান বলে মনে করাহয়। এখন হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব যদি কোনো কিছুর 'গুন' না হয়, তাহলে তা প্রাকৃত না অপ্রাকৃত গুণ সে প্রশ্ন অবান্তর। Moore এর দোষ হলল তিনি ভালত্ব কে পীত বর্ণের মত একটি গুণ বলে ভেবেছেন ; তাদের মধ্যেতফাৎ হল : কোন বস্তুর যেমন পুষ্পের বা শাড়ীর গুণ হলেও, ভাল্ব কোন কর্মের নিজস্ব বিষয়গত গুণ নয়। কর্ম যদি নির্গুন ও নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে ভালত্বকেমানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার 'গুণ' বলবো কেন? মনে হয় Moore শ্রেনী বিভ্রান্তি ঘটিয়ে ফেলেছেন। কর্ম কোনো দ্রব্য নয় বলে তার গুণ থাকতে পারে না। কোনো বস্তুর বা কর্মের 'মূল্য' থাকতে পারে আর তাদের হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব তাদের কোনো 'গুণ' নয়।

J.L. Macki তাঁর গ্রন্থে একটি বিষয়ের অবতারনা করেছেন যাকে আমরা তাঁর কথাতেই 'নৈতিক সংস্কার বাদ' বলে অভিহিত করতে পারি। সংস্কারবাদীরা মনে করেন যে জ্ঞান রাজ্যে মানুষের কোনো জ্ঞানই চূড়ান্ত ভাবে সত্য হতে পারে না ; কম বেশী সম্ভবপর হয় মাত্র। তবে একথা ঠিক যে নৈতিক সংস্কারবাদ এরকমের জ্ঞানীয় সংশয়বাদ নয়। তাঁর মতে নৈতিক সংস্কারবাদ কেবলমাত্র একটা নেতিমূলক ও তত্ত্বগত মতবাদ। বাহ্যিক জগতের কোন অংশে নৈতিক মূল্য থাকতে পারে না। আমরা কোন বস্তুকে চাই বলে বস্তু 'ভালো' হয়। এরকম সংস্কারবাদ ক্ষতিকারক নয়।

মূল্যবোধক বিশেষন গুলো ভালো - মন্দ, নৈতিক ও অনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। যা কিছু কাম্য, যা কিছু সন্তোষজনক তাকেই মূল্যবান বলতে হবে। নৈতিক মূল্য কেবলমাত্র মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় বা তার চরিত্রে থাকে। ভালো তারা আর ভালো মানুষের মূল্যই কেবল নৈতিক মূল্য হয়। সব মূল্যই যে বিদ্যার আলোচভ বিষয় তাকে মূল্য বিজ্ঞান বলে। নীতিবিদ্যা তার একটি শাখা মাত্র।

নীতিবিদ্যার পরিধি :

নীতিবিদ্যার পরিধি বলতে আলোচ্য বিষয়বস্তুর ব্যপকতাকে বোঝানো হয়। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে নৈতিক আদর্শের স্বরূপকে সংজ্ঞায়িত করে। কিন্তু ইহা মানব আচরণের স্বরূপ উৎপত্তি অথবা পরিবর্ধন নিয়ে আলাদা ব্যপৃত থাকে না।

যে আদর্শের সঙ্গে আমাদের সঙ্গতি থাকবে সেই আদর্শ নিয়ে ইহা আলোচনা করে। কিন্তু আদর্শের আচরণকে জানতে গেলে দরকার আচরণের স্বরূপ। আচরণ হল চরিত্রের অভিব্যাক্তি। আবার চরিত্র হল ইচ্ছার নিয়ন্ত্রিত অভ্যাস। অভ্যাসজাত ক্রিয়া থেকে যে স্থায়ী সৃষ্টি হয় তাই চরিত্র। চরিত্রের স্বরূপ অধ্বীক্ষণ করতে গিয়ে কাজের উৎস, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, ঐচ্ছিক ক্রিয়া, অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ইত্যাদি। এইভাবে দেখা

যাচ্ছ যে নীতি বিজ্ঞানের নীতি হল মনঃস্তাত্বিক।

নীতিবিজ্ঞানের কাজের উৎস, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ইত্যাদি জানার একটাই কারণ যাতে অনায়াসে তাদের ওপর নৈতিক বিচার আরোপ করতে পারে । নীতিবিজ্ঞানের মৌলিক সমসভা হল নৈতিক আদর্শের স্বরুপকে খুঁজে বার করে উদ্ঘাটিত করা যার প্রেক্ষিতে আমরা নৈতিক বিচার আরোপ করতে পারি।কল্যাণ কী অথবা নৈতিক আদর্শ কী ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে নীতিশাস্ত্র সর্ব্বোচ্য কল্যাণ বা প্রধান ভাল কী ? সব ভাল কাজে ভাল কী ? ভালোর স্বরূপকে অন্বেষণ করলেও নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শকে কীভাবে উপলব্ধি করা যায় সে সম্পর্কেকোনো নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে না।

নৈতিক আদর্শের সঙ্গে কোনো কাজের সঙ্গতি থাকে তা সঠিক বলে বিবেচিত হয় ; যখন সঙ্গতি থাকে না তখন তাকে বেঠিক বলা হয়। সাধারন ভাবে শুভাশুভ কর্মের ধারণা আমাদের সকলেরই আছে । তবে সব সময়েই যে সেই চরমতম কল্যাণকর আদর্শের ধারণা আমাদের কাছে প্রকট বা স্পষ্ট ভাবে থাকে, তা নয়। যখন কোনো কর্মকে উচিত বা ভাল আর অন্য কর্মকে অনুচিত বা মন্দ বলি তখন নৈতিকতার আদর্শ থেকে অস্পষ্ট ভাবে মনে থাকতে পারে। কেবল যে সব ক্ষেত্রে কোনো কর্মকে ভাল না মন্দ বলবো এমন দ্বিধায় পড়ে যাই, সে সব ক্ষেত্রে নৈতিকতার আদর্শটিকে প্রকট করতে হয়।

মানুষের আচরণের চরমতম বা উদ্দশ্যটি যে কী তা নির্ণয় করা দূরুহ। এই চরমতম কল্যাণের আদর্শ সম্বন্ধে নীতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোনো মানুষ হয়তো সারা জীবন ধরে বিদ্যার্জন করাকেই চরমতম কল্যানকর আদর্শ বলে ভাবেন ; অন্য কেউ বা সম্মান বা প্রতিষ্ঠান লাভের চেষ্টায় তৎপর হন। অন্যেরা হয়তো সর্বাধিক মাত্রায় সুখ বা আনন্দ লাভ করাই জীবনের চরমতম উদ্দেশ্য বলে ভাবেন। নৈতিক দার্শনিকেরা মানব জীবনের কল্যাণের আদর্শকে স্পষ্ট ভাবে নির্ণয় করতে চান। কোনো কোনো দার্শনিক বলেন যে ঐ চরমতম কল্যাণের আদর্শ সব মানুষের পক্ষে এক এবং অদ্বিতীয়। ঐ আদর্শ এক বা বহু যাই হোক না কেন, বুদ্ধিবাদীদের মতে ঐ শুভ আদর্শের মানুষের সব আচরণের ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত নির্ধারণ করা সম্ভব। তাই নীতি বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে পড়ে সর্বোত্তম ইষ্ট আদর্শ কে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা। তবে একথা ঠিক যে মানুষের চরমতম ইষ্ট তার জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত হয় না । তাহলে এই আদর্শ প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ ভাবে জানতে হবে । এইভাবে আমরা বলতে পারি যে নীতি বিদ্যার পরিধীর মধ্যে অতীন্দ্রিয় আদর্শের জ্ঞান পাওয়ার চেষ্টা প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রয়েছে।

আমরা ভাল কাজকে কর্ত্তব্য বলে মনে করি। নৈতিক আইনের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য চরিতার্ধ হয় তা ভাল । এই উদ্দেশ্যের একটা স্তর বিন্যাস থাকে । মঙ্গল

টিপ্পনী

ব্যাক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে, আবার চুড়ান্ত মঙ্গল ও রয়েছে । বলাই বাহুল্য, নীতিবিদ্যা এই সর্বোত্তম মঙ্গলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে নীতি বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা হল ভাল, কর্ত্তব্য এবংমঙ্গল ; এই সব গুলোই নীতি বিদ্যা অন্বেষন করে থাকে।

টিপ্পনী

নীতিবিদ্যা নৈতিক বিচারের স্বরূপ, উদ্দেশ্য এবং মান নিয়ে আলোচনা করে। আমরা আগেই দেখলাম যে নীতিবিদ্যার বিষববস্তুই হল নৈতিকতা। আমরা অপর মূল্যয়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই নেই কারণ তারা মানব আচরণ মুখী নয়। কিন্তু নৈতিক বিচারের অভিমুখ থাকে আচরণের দিকে। আমরা নেতিক বিচার বলতে কী বুঝি ? মূল্যবিষয়ক বিচার হিসেবে নৈতিক বিচার তথ্যবিষয়ক বিচার থেকে পৃথক। যা আছে তার সম্বন্ধে একটা নিছক বিবরণ দেওয়া হল তথ্যবিষয়ক বিচারের কাজ। সেইজন্য একে বর্ণনামূলক বিচার বলা হয়। কিন্তু নৈতিক বিচার হল একটা নির্দিষ্ট কাজকে ভাল বা মন্দ বলে চিহ্নিত করা এবং এটা সম্পূর্ণ মানসক্রিয়া। এই বিচারের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীয় অথবা বৌদিক, আবেগজ এবং ঐচ্ছিক উপাদান। নৈতিক চেতনার মধ্যে নিহিত থাকে জ্ঞানীয় উপাদান রূপে নৈতিক বিচার ; আবার এই নৈতিক চেতনার মধ্যে থাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সাক্ষাঃ প্রতীত। আমরা কোনো কাজকে যে ভাল বা মন্দ, নৈতিক চেতনার ওপর। নৈতিক চেতনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অধিকার এবং কর্ত্তব্য, পাপ ও পূণ্য, দোষ ও গুন, কর্ত্তব্যবোধ অথবা দায়বদ্ধতা।

আমরা যখন কোনো কাজকে ভাল বলে প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুভব করে থাকি। যখন আমরা কোন কাজকে ভুল বলে প্রত্যক্ষ করে থাকি তখন সেই কাজকে আমাদের ওপর কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতার চাপে থাকে না। আবার নীতিশাস্ত্রের পরিধীর মধ্যে থাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা। আমরা আমাদের কাজের জন্য দায়িত্ববান হয়ে পড়ি। অনুরূপভাবে অপরাধীরাও তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ অপরাধের জন্য দায়ী হয়ে পড়ে। অতএব, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। শাস্তির মূলে যে নৈতিক তাৎপর্য রবেছে তা তুলে ধরে নীতিশাস্ত্র।

আমরা স্পষ্টতঃই বুঝতে পারছি যে নীতিশাস্ত্রের নিজস্ব পরিধি থাকলেও এটা কিন্তু অধ্যায়নের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মনোস্তাত্বিক, দার্শনিক, সমাজতাত্বিক এবং রাজনৈতিক এই সব কিছু সমস্যার সঙ্গে নীতিবিজ্ঞান জড়িত রয়েছে পরোক্ষভাবে এখন প্রশ্ন হল - কী কী মনোস্তাত্বিক প্রশ্ন রয়েছে যার সঙ্গে নীতি বিজ্ঞান জড়িত রয়েছে ? যেমন, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ, কাজের উৎসের শ্রেণীকরণ, কামনা এবং সুখের মধ্যে সম্পর্ক। দার্শনিক সমস্যার মধ্যে পড়ে ব্যাক্তিত্বের স্বরূপ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমলতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং বিশ্বের নৈতিক শাসন। সমাতাত্বিক সমস্যার মধ্যে পড়ে সমাজ এবং ব্যাক্তির সম্পর্ক। রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যাক্তির সম্পর্ক রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক নৈতিকতা।

ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া :

'নৈতিক' শব্দটা বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করা হয়। ভালো বা মন্দ অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ। নৈতিক এই শব্দটারমধ্যে নৈতিক গুণ, ভালোত্ব বা সদত্ব বিদ্যমান থাকে। অনৈতিক বলতে নৈতিকগুণ বর্জিত কোন কিছুকে বোঝানো হয়।

টিপ্পনী

মূল্যবোধক বিশেষনগুলি, ভালো-মন্দ, নৈতিক ও অনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারা যায়। যা কিছু কাম্য, যা কিছু সন্তোষজনক বা প্রশংসা যোগ্য তাকেই মূল্যবান বলতে হবে। টাকা কড়ির বিনিময়ে মূল্যবান পণ্য সংগ্রহ করা যায় ; তাই টাকা কড়ির 'বিনিময়' মূল্য থাকলেও নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। জ্ঞান - বিজ্ঞান, প্রখর বুদ্ধি, চাতুর্য্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য্য, লালিত কলা প্রভৃতু সবই মানুষের কাম্য বলে মূল্যবান। সুন্দর ছবি, গান, মূর্তি, কবিত, নাটক প্রভৃতির সৌন্দর্য্য মূল্য বা নান্দনিক মূল্য থাকে। আবার কোনোও পবিত্র বস্তুর যথা, তুলসী, চন্দনের, ঠাকুর ঘরের,মন্দির -মসজিদের ধর্মীয় মূল্য থাকে। এই সমস্ত 'বিনিময়', 'নান্দনিক'' বা ধর্মীয় মূল্যের কোনোটাই 'নৈতিক' মূল্য নয়। নৈতিক মূল্য কেবলমাত্র মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মে বা তার চরিত্রে থাকে। ভাল কাজ আর ভাল মানুষের মূল্যই কেবল নৈতিক মূল্য হয়। নৈতিক - অনৈতিক সব মূল্যই যে বিদ্যার আলোচ্য বিষয় তাকে মূল্য বিজ্ঞান বলে। নীতিবিদ্যা তার একটি শাখা মাত্র।

মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বাঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং যে নীতি বা বিধি অনুযায়ী ঐ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, একমাত্র তাদেরই নৈতিক মূল্য থাকবে। মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কাজ, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত এই স্বেচ্ছাকৃতকর্ম হঠাৎ হয়ে পড়ে না ; সচেতন বা অবচেতন কোনো না কোনো নীতি অনুযায়ী ঐ কর্ম সাধিত হয়। কর্ম অথবা কর্মের নীতি স্বাধীন ভাবে নির্বাচিত হয় বলে, কর্তাকে ঐ কর্ম বা কর্মনীতির দায়িত্ব বহন করতে হয়। এইজন্য সৎকর্মের জন্য প্রশংসা, অসৎ কর্মের জন্য নিন্দা প্রাপ্য হয়।

কোনো বিশেষ স্থানে - কালে অনুষ্ঠিত কর্ম এবং ঐ কর্মের সাধারণ নীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয়েরই নৈতিক মূল্য থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ নন্দিতা অজয়কে কথা দিল সে অজয়কে বিয়ে করবে। নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সে শেষ পর্যন্ত অজয়কে বিয়ে করল। নন্দিতা এই কাজটি স্বেচ্ছায় করেছে -- কাজটা হঠাৎ হয়ে পড়েনি। 'কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা উচিত' - এই সাধারণ কর্মনীতি বা বিধি অনুযায়ী নন্দিতা নিজে করেছে এবং অবশ্যই সে ঐ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই কাজে ভাল বা মন্দ যে ফল বা পরিণতি হোক না কেন তা নন্দিতার ওপরেই বর্তাবে। কিন্তু ঐ কর্মনীতিটি সাধারণ কেননা ঐ নীতি অনুযায়ী আরও অনেক ব্যাক্তি নানা সময়ে একই ধারার কর্ম করতেপারবে। মানুষের কাজ অথবা কর্মনীতি উভয়ই 'ভালমন্দ'. 'উচিত-অনুচিত' এবং মূল্যবান' বা 'মূল্যহীন' হয়। একেই নৈতিক মূল্য বলে। ভাল আপেল বা

টিপ্পনী

ভাল কলমের মূল্য অনৈতিক। নিজের বা বহুজনে সুখ - স্বাচ্ছন্দ্য আমার কর্মে আদর্শ, পরিণাম বা ফল হতে পারে ; কিন্তু কর্ম নয় বলে ঐ ফলের মূল্য অনৈতিক।

মানুষের কর্ম বা কর্মনীতি অসংখ্য হতে পারে। 'সত্যবলা', 'প্রতিভা রক্ষা করা', নিষ্ঠুরতা বর্জন করা', 'পরীক্ষায় নকল না করা' বিবাহিত পত্নীর ভরণ-পোষণ প্রভৃতি নানাবিধ কর্মনীতিকে ভাল বা উচিত বলা হয়। আবার 'অকারনে পরকে দুঃখ দেওয়া', 'কথা দিয়ে কথা না রাখা'ইত্যাদিকে দুর্নীতি বা মন্দ বলা হয়। একমাত্র কর্ম অথবা কর্মনীতি ভিন্ন অন্য সব কাম্য পদার্থের মূল্য অনৈতিক।

যে বস্তু কাম্য বা ইষ্ট হবার জন্য কোনো কাম্য বস্তুর ওপরে নির্ভর করে না, তারই স্বাধীন বা স্বকীয় মূল্য থাকে। মানুষের জীবনে অভীষ্ট এবং উপায়ের মধ্যে এক 'ক্রম' দেখা যায়। আর এই ক্রম সহজেই চরমতম, স্বতোমূল্যান অভীষ্টে পৌঁছে দিতে পারে। এই ক্রমে চরমতম সন্তোষ উৎপাদনকারী অভিষ্টের দিকে আমাদের অগ্রগতি। এ ব্যাপারে সকল দার্শনিক একমত নন।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং অভিপ্রায় সহকারে কোনো আগাম উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য করা হয়। কর্তার এই কাজ করার পশ্চাতে থাকে ইচ্চা। এইঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি স্তর থাকে। যথা, - মানসিক স্তর, শারীরিক স্তর এবং চেতনার বাহ্যিক স্তর।

মানসিক স্তর :

প্রত্যেক ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পশ্চাতে কাজের উৎস রয়েছে। ঐচ্ছিক ক্রিয়া হচ্ছে অভাবের অনুভুতি, তা বাস্তবই হোক এবং আদর্শই হোক। এটা হয় সহজাত প্রবৃত্তি অথবা বৌদ্ধিক, নৈতিক অথবা নান্দনিক কামনা বা বাসনা। অভাবের অনুভূতি সর্বদাই খুব যন্ত্রনাময় হয় এবং তা উদ্রেক করে। কিন্তু এটা স্বাভাবিক ভাবে সুখ বিস্তৃ হয় ; তার কারণ হল ভবিষ্যতে অভাবের পরিতৃপ্তি হলে মানুষ সুখী হবে কিন্তু যদি কোনো কারনে তা যদি পরিতৃপ্ত না হয় তাহলেও পরিতৃপ্তির একটা অনুভুতি থাকে , কিন্তু অকাম্য অনুভুতি কাম্য অনুভুতির উদার প্রভাব বিস্তার করে।

শারীরিক স্তর :

অভাবের অনুভূতি কামনায় রূপান্তরিত হয়। আত্মচেতনা এর উদর প্রাধান্য বিস্তার করে তাকে কামনায় রূপান্তরিত করে। এটা অন্ধ কিছু নয় ; ইহা আত্ম-চেতনার দ্বারা আলোচিত। কামনা হল কোন কিছু চরিতার্থ করবার জন্য লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। কামনার মধ্যে থাকে বস্তু বা উদ্দেশ্য যা অভাবের অনুভূতি চরিতার্থ করবে। উদ্দেশ্যকে উপলব্ধধি করবার জন্য মাধ্যমও রয়েছে। সে মাধ্যম বাহিত কি অবাহিত তা কোন বিচার্য্য বিষয় নয়। মনে রাখতে হবে একটা সরল কাজ যেখানে উদ্দেশ্যের

দ্বন্দ্ব থাকে না সেখানে খুব দ্রুত নির্বাচন বা স্বচ্ছন্দ তৈরী করা যায় এবং তা কাজের মধ্যে সম্পাদিতও হয়।

চেতনার বাহ্যিক স্তর :

ক্রিয়ায় সময়ে সময়ে মনের মধ্যে বিবিধ উদ্দেশ্যর দেখা মিলে এবং শুধু তাই নয় তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একই সময়ে বহু চাহিদা পরিতৃপ্তি চায়। এর ফলে মানব মন বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে উদ্দেশ্যগুলো বা চাহিদাগুলো পরস্পরের সাধে সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। তাদের মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকে না। উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব না বলে কামনার দ্বন্দ্ব বলা শ্রেয়।

বলাই বাহুল্য, অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিপরীত। হাঁচি বা কাশি প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কিছু বাহ্য ফলাফল দেখা দেয়। যেমন, হাঁচি দিলে টেবিলের কাগজ উড়ে যেতে পারে, এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার একটা প্রাণবন্ত উদাহরণ কবি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন :

দত্তবাড়ীর ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া।

আঁতকে উঠে কাঁকের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।।

এটা সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। চোখের দিকে কিছু গেলে চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায় ; ফলে চক্ষু রক্ষা পায়। কিন্তু এই সব অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কোনো আন্তর, মানসিক কারণ নেই ; কোনো প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঐ কাজ সচেতন ভাবে লরা হয় না। কোনো ইচ্ছা বা অভিলাষ ঐ কর্ম উৎপন্ন করে না।

নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু :

নৈতিক বিচার তথাগত বিচারের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিচারই হল নৈতিক বিচার। তথ্যাগত বিচারকে অনেক সময় বর্ণনামূলক বিচারও বলা হয়ে থাকে। নৈতিক বিচারের মাধ্যমে একটা কাজকে ভাল-মন্দ, নৈতিক অথবা অনৈতিক নির্ভর করছে নৈতিক চেতনার ওপর। এই নৈতিক চেতনার অপরিহার্য্য অঙ্গ হল কর্ত্তব্য এবং অধিকার, ভাল-মন্দ, দায়িত্ববোধ অথবা দায়বদ্ধতা। নৈতিক চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনুমোদন - অঅনুমোদন। এই নৈতিক বিচার নৈতিক রস এর দ্বারা অনুসৃত হয়। কিন্তু এই বচারের বৈধতা বা অবৈধতা নিরুপন করবার জন্য কোনো মানদন্ড এখনো পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। নৈতিক রস কিন্তু নৈতিক বিচারের দ্বারা অনুসৃত হয় না।

নৈতিক বিচারের বিষয়গত বৈধতা রয়েছে। আত্মগত প্রবণতা যথা অহংকার,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সংস্কার অথবা কুসংস্কার, আশংকা অথবা অণুগ্রহ, পচ্ছন্দ অথবা অপচ্ছন্দ, আসক্তি অথবা অনাসক্তি বিবর্জিত হয়ে এই বিচার নৈর্ব্যক্তিক হয়ে দাঁড়াব। নৈতিক মূল্যায়নের বিষয় বস্তু যে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা ঐ ক্রিয়ার নীতি একথা সর্বজনগ্রাহ্য। যে আচরণগুলো মানুষ স্বেচ্ছায় করে ; শ্বাস গ্রহয় করার মত যেগুলি করতে সে বাধ্য নয় ; যে কাজ সে না করেও পারে, সে রকম কাজ বা আচরন নিন্দিত বা প্রশংসিত হতে পারে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা আচরন অত্যন্ত জটিল - তা কামনা বাসনা প্রভৃতি মানসিক কারণে ঘটে থাকে। কর্তার কোনোও উদ্দেশ্য লাভের কামনায় ঐকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এবং ঐ কাজের কিছু বাহ্য ফলাফলও আছে। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ও সুখবাদীরা বলেন যে, ঐচ্ছিক কর্মের বাহ্য ফল যদি ভাল হয় তাহলে কর্মটিকে ভাল বলতে হবে। যে কাজ সর্বাধিক মানুষের উপকার বা সুখসাধন করে তাই ভাল। এই জন্যই ঐচ্ছিক কর্মের বাহ্য ফলকেই নৈতিক বাক্যের বিষয়বস্তু বলতে হবে। কর্মের বাহ্য ফল প্রত্যক্ষ করা যায় ; আর যদি সেই ফল উপকারী হয় তাহলে কাজটি ভাল ; আর যদি অনুপকারী হয় তাহলে কাজটি মন্দ বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু বাহ্য ফলের সকল বিচার করলেই হবে না ; কর্তার কর্ম করার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অবশ্যই বিচার করতে হবে। কর্তা অনেক সময় অভিপ্রেত হয়ে দাঁড়াতে পারে। কর্তা যদি ভিখারীকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রা সজোরে ছোঁড়েন এবং তা যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় এবং যদি ভিখারী নিক্ষিপ্ত মুদ্রাটি তুলে নিয়ে খাবার সংগ্রহ করে তাহলে কর্মের ফল ভাল হলেও কর্তার কর্মটিকে মন্দই বলতে হবে। কর্তার অভিপ্রায় মন্দই ছিল এবং তিনি অভিপ্রেত ফল লাভ করেন নি।

অভিপ্রেত কল যে কী তা বুজতে হলে কর্তার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় দুই বুঝতে হবে। দার্শনিকরা সাধারনতঃ অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। অভিপ্রায় উদ্দেশ্য থেকে ব্যাপক। উদ্দেশ্য হল সেই মূল্যবান পদার্থের ধারণা যাকে অবিকার করার জন্য আমি কর্মে নিযুক্ত হই। আমার অভিপ্রায় বা কামনার বিষয় য়ে সেই মূল্যবান উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য লাভের উদারকেও গ্রহণ করতে হবে।এই উছাস যদি দুঃখজনক হয় আর ঐ উপায় ছাড়া যদি উদ্দেশ্য লাভ না হয় তা হলে কাজ করতে গেলে, সেই দুঃখজনক উপায়কেও গ্রহণ করতে হবে। উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়কেই চাইতে হয় , আর তারা অভিপ্রায়ের মধে পড়ে দুরদেশে পালিয়েযায়ার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহকরতে যদিআমার আংটি বিক্রি করতে হয় তাহলে ঐ আংটি বিক্রি করা আমার অভিপ্রেত হবে, যদিও তা আমার কাম্য উদ্দেশ্য নয়। এইজন্য অভিপ্রায় উদ্দেশ্য থেকে বাপকতর হয় - অভিপ্রায়ের মধ্যে উদ্দেশ্য এবং উপায় উভয়েই নিহিত থাকে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সামগ্রিক মূল্যায়ন হয়ে থাকে। ঐ কর্মের অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য

এবং অভিপ্রেত ফল যদি ভাল হয় তবেই কর্মটি ভাল বলে বিবেচিত হবে ও প্রশংসিত হবে। কেবল বাইরের খারাপ ফল দেখে বিচার করা ঠিক নয়। সৎ উদ্দেশ্য হত্যা করা যায় যদি কোনো দূরারোগ্য বাধিরোগী কে রোগ যন্ত্রনা ভোগ করা থেকে মুক্তি দিতে, চিকিৎসা বন্ধ করে তাকে হত্যা করা হয় তাহলেসেই দয়ালু, সহৃদয় হত্যা খারাপ হবে কেন ? একথা ঠিক যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধও পাল্টে যায়।

নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য আমরা এভাবে আলোচনা করে দেখবো কেন ? এই স্বীকার্য সত্যের প্রশ্ন ওঠে ? মানুষের কাজকে নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আনা যায় কারণ মানুষ কোনো কিছু নির্বাচন করতে এবং সেইমত কাজ করতে স্বাধীন। সে স্বাধীন বলেই তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং নির্বাচন মানবিক কাজের অপরিহার্য্য সত্য এই স্বাধীনতা ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দায়বদ্ধতা। মানুষ যদি স্বাধীন না হোত পরন্তু অমানবিক উপাদানের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে কোনো কাজ এবং ঘটনার মধ্যে পার্থক্য থাকত না। স্বাধীনতাবলতে আমরা বুঝি যে মানুষ যে কোন একটা পন্থায় কাজ করতে স্বাধীন। স্বাধীনতার প্রয়োগ বলতে আমরা বুঝি অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া। এটার অর্থই হোল আমরা অন্তরে কামনা করে থাকি । অতএব কাজের মুলে রয়েছে অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যখন মানুষ কোন কিছু করতে স্বাধীনতা ভোগ করে তখন মনে রাখতে হবে সে সেই কাজের ফলভোগ তাকেই ভোগ করতে হে ; সে এর জন্য দায়ী হয়ে পড়ে। এই নৈতিক দায়বদ্ধতা স্বাধীনতার একটা অঙ্গ বলে মনে হয়। স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা ধারণাগত ভাবে এবং নৈতিকভাবে নৈতিক বিষয়ের অংশ বলে বিবেচিত হয়। নৈতিকতার সঙ্গে জীবন যাপন অর্থপূর্ন এই কারণে যে মানুষ বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন জীব এবং সাথে সাথে মুক্ত ও বটে। এই বুদ্ধি বৃত্তিকেও আমরা নৈতিক বিচারের একটা স্বীকার্য্য সত্য বলে মনে করি। বুদ্ধি বৃত্তি ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে মানুষকে সাহায্য করে ; কিন্তু স্বাধীনতা একজনকে হয় ভাল না হয় মন্দকে অনুসরণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে একই কাজ ভাল অথবা মন্দ রূপেবিবেচিত হতে পারে এবং একই সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তির দ্বারা তা হতে পারে। নৈতিক মূল্যায়নের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দেয় তা নৈতিক মানদন্ডের প্রেক্ষিতেই হয়। নৈতিকতার আর একটি স্বীকার্য্য সত্য হল ব্যাক্তিত্ব। ব্যাক্তির জীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজস্থ জীব হিসেবে অন্য মানুষের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা সবই নির্ধারণ করে মানুষের কাজের ধারা কী হবে। অর্থাৎ একজন ব্যাক্তিত্ববান ব্যাক্তি এমন কিছু হালকা কাজ করবেন না যা সমাজের কাছে নিন্দিত হয়। যদিও আমরা সঙ্কীর্ন স্বার্থপরতা ও জান্তব প্রকৃতি বশতঃ যা করা উচিত তা জানিয়ে দেয় আর ঐ কাজ করার বাধ্যবাধকতা আমরা অনুভব করি।

আমরা নৈতিকতার স্বীকার্য্য সত্য হিসেবে যা কিছুকেই গ্রহণ করি না কেন Frankena মনে করেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলমুখী নৈতিকতা আর অন্য

টিপ্পনী

ক্ষেত্রে কর্তব্যমুখী নৈতিকতা আমাদের দায়িত্ববোধ ব্যাখ্যা করে বলে এই দুই নৈতিকতাকেই বিকল্পরূপে গ্রহণ করতে হবে ; এদের কোনোটাই এককভাবে আমাদের দায়বোধ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান : অধিকার এবং মানব অধিকার ও বৈশিষ্ট্য

টিপ্পনী

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান মূলতঃ কঠিন এবং বিতর্কিত সামাজিক প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে : সাম্য এবং জাতি, মৌন, সামর্থ্য, গর্ভপাত এবং ভ্রুন পরীক্ষা। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি। এগুলো Singer ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রাসহগিক যুক্তি সহযোগে মূল্যায়ন করবারও চেষ্টা করেছেন।

ব্যাক্তি বা কোন সামাজিক সংস্থার কতকগুলো দাবীকে আমরা অধিকার বুঝে থাকি। এই দাবী সরকারী আইন দ্বারা সুরক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে নৈতিক নিয়মে পালিত হয়।

বাঁচার অধিকার, নিব্য সম্পত্তি গোচার অধিকার, স্বাতন্ত্রের অধিকার, মৌলিক অধিকার।

আবার নৈতিক বা সামাজিক অনুমোদনের দ্বারা সমর্থিত কিছু কিছু অধিকার থাকে। নাবালক হল কন্যারা তাদের আজ্ঞানুবর্তী হবে এমন দাবী করতে পান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকারী আইন প্রয়োগ করা হয়। জোর করে পুত্রসন্তানকে দিয়ে কিছু করালে তা মোটেই শুভ ফল দিতে পারে না, তবে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধে বল প্রয়োগ করতে পারে।

আর্ধমনের পক্ষে ঠিক সময় ঋণ পরিশোধ করে উত্তমর্ণের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্মত ; এই দায়িত্ব গ্রহণ না করলে ঋণ গ্রহীতা কে শাস্তি পেতে হয়। এটা স্পষ্ট যে কেবল মাত্র কোনো রাষ্ট্রে, পরিবারের বা অন্য কোনো সামাজিকক সংগঠনের সভ্য হলেই ঐ সভ্যের কিছু অধিকার জন্মায়। পরিবারের মধ্যেই পিতার অধিকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্রের অধিকার, রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিকের অধিকার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সব দেশেই সাধারণতঃ মানুষের কতকগুলো মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়। যেমন -

(১) বেঁচে থাকার অধিকার

(২) সম্পত্তির অধিকার

(৩) স্বাধীনতার অধিকার

টিপ্পনী

(৪) অপরের সঙ্গে বিশেষ রকমে চুক্তি করার অধকার

(৫) শিক্ষা লাভের অধিকার ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হল দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা কৃষ্ণাঙ্গদের নিরক্ষর থাকার ব্যাপারে কোনো রকম উৎসাহ দেখাত না ; তাদের শিক্ষিত হওয়ার অধিকার শ্বেতাঙ্গরা স্বীকারেই করত না। আমরা তাদের আদর্শ রাষ্ট্র বলি না। মৌলিক অধিকার গুলো বিনা বাধায় ভোগ করতে পারলে মানুষ ধীরে ধীরে তার উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে। সকলের হিতার্থে এই অধিকার স্বীকার করলেই রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

সামাজিক প্রেক্ষিতে অধিকার ও কর্তব্যকে পরস্পর সাপেক্ষ বলা যায়। এক অর্থে কোনো অধিকার ভোগ করলে সমাজে কিছু দায়িত্ব বর্তায় আর ঐ দায়িত্ব পালন অধিকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য । আমরা যদি শিক্ষা লাভের অধিকার থাকে তাহলে সেই শিক্ষা নিজেরো সমাজের দশজনের হিত সাধনের প্রয়োগ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে অধিকার যদি রাষ্ট্র বা সমাজ সমর্থিত কোনো দাবি হয় তাহলে সেই দাবি পূরন করার দায়িত্বকে অনায়াসে কর্তব্য বলা চলে। অধিকারের প্রেক্ষিতেই কর্তব্য কর্মকে বুঝে নিতে হবে । সন্তানের যদি প্রকৃত শিক্ষা থাকার অধিকার থাক তাহলে পিতামাতার কর্তব্য বা দায়িত্ব হল তাকে সেই অধকার থেকে বঞ্চিত না করা। এই কারণে অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সাদরে সমাজে একজনের যা অধিকার অপরজনের তাই কর্তব্য। রেল গাড়ী দিয়ে ভ্রমণ করা যেমন আমার অবিচার তেমনি সেই অধিকাররক্ষা করার দায়িত্ব থাকে রেম কর্ত্তপক্ষের । পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে তাঁরা আদায় করতে পারেন না। তাঁদের সন্তান তাঁদের আজ্ঞাবহ হবে।

যদিও কিনা মানুষ স্বভাবত কোন একটা পদ বা সামাজিক অবস্থানে থাকতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে, তবু মাঝে মাঝে অন্য অবস্থানে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। সেই সময় একাধিক কর্তব্য জগতে স্থান নিলে কর্তব্যের সংঘাত হয় । আমাদের বিবেকই আমাদের পথ পদর্শক।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
48

‘মানব অধিকার’ (Human right) অনেকার্থক। এক অর্থে ইহা স্বাভাবিক অধিকারের সমার্থক যা মানুষ অর্জন করতে অধিকারী হয়। আর এক অর্থে আইনের মধ্যে দিয়ে যে অধিকার মানুষ অর্জন করে তা হল মানব অধিকার। অনেক সময় এই দুটো অর্থ একত্রিত হয়ে যায় এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত : আরও দুটো শব্দ রয়েছে যেমন বাধ্যবাধকতা (Obligation) এবং অধিকার (Prerogative) যার জন্য অধিকার শব্দটা ভুল বশতঃ ব্যবহার করা হয়। সময় সময় ‘অধিকার’ এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়; সময় সময় অধিকার শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ

অধিকার সমূহ (Rights) । ভুলের বিপরীত অর্থে নৈতিক শুদ্ধতা (Moral correctness) বোঝাতে গিয়ে শব্দটা বহুবচনে ব্যবহার করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং বাল গঙ্গাধর তিলক থেকে গান্ধী পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় 'অধিকার সমূহ' এই শব্দটা। প্রয়োগগত দিক থেকে বহু বিবর্তনের মধ্যে গেছে এবং মাঝে মাঝে শব্দটার অপব্যবহারও হয়েছে। ১৯৪৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে রাষ্ট্রপুঞ্জের General Assembly মানব অধিকার সমূহের সর্ব্বজনীন ঘোষনার পর এবং ভারতবর্ষে ২০০৫ সালে RTI (Right to Information) চালু হয়ে যায়ার পর তখন থেকে 'মানব অধিকার সমূহ' এই সম্প্রত্যয়টি গৃহস্থের মুখে মুখে শিনাযায়।

একটা শক্তিশালী দেশ যখন দূর্বল দেশের প্রতি প্রভুত্বের দৃষ্টিভঙ্গী দেখাবার চেষ্টা করে তখন তাকে আমরা হালকা ভাবে নিতে পারি না। এই প্রসঙ্গে মানব অধিকারের ভঙ্গের অভিযোগ ভারত, পাকিস্থান, ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় এই দেশগুলিকে আমেরিকা তার কব্জায় রাকে চায়। এই ছুতোয় এবং অন্যায্য ছুতোতে ও ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে বসল। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সমসাময়িক ভৌগলিক - রাজনৈতিক বিন্যাসের নৈতিক মর্যাদা মূলায়ন করার সময় এসে গেছে ; বলাই বাহুল্য মানদন্ড হল মানব অধিকার। অতএবঃ মানব অধিকার একটা শক্তিশালী নৈতিক মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানব অধিকার মৌলিক নৈতিক রক্ষাকবচ হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে ; সবদেশে এবং সব সময়ে কৃষ্টিয় এবং ধর্মীয় বিভাজন নিরপেক্ষ হয়ে এই অধিকার মানুষের প্রাপ্য। মানব অধিকারের আবেদন নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিবরণ হতে পারে না। নৈতিকতা মানব অধিকার থেকে আরও ব্যাপক এবং বৃহত্তর।

ভাল জীবন যাপন করবার জন্য প্রত্যেক মানুষের মৌল চাহিদা হল মানব অধিকার। এই চচাহিদা সদর্থক (Positive) অথবা নঞর্থক হতে পারে (Nagative)। সদর্থক চাহিদার মধ্যে পড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং শিক্ষা। নঞর্থক চাহিদার মধ্যে পড়ে বৈষম্য এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে অধিকার। James Nickle এর ভাষা, "মানব অধিকার ব্যাক্তির জন্য এমন অপরিহার্য্য শর্ত আদায় করবার চেষ্টা করে যারমাধ্যমে নূন্যতম ভাল জীবন যাপন করতেপারা যায়"। (Human rights aim to secure for individuals the necessary on ditions for leading a minimally good life.")

Lant এর তাৎপর্য্য হল মানুষ নিজেরাই তাদের উপর মানব অধিকার অর্জণ করে অর্থাৎ তারা নিজেরাই অর্জণ করে যায়ে এবং এগুলো স্বয়ং শাসিত। অতি প্রাকৃতিক (Super natural) দ্বারা মানব অধিকারের অর্জিত হয়না। সমসাময়িক আনুষ্ঠানিক উত্তর কালে মানব অধিকারের ধারনার সঙ্গে স্বাভাবিক অধিকারের পার্থক্য অনুভুত হয়। প্রথমত : সবাই যাতে এই অধিকার সমানভাবে উপভোগ করতে পারে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয়ত : ব্যাক্তি একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয় ; তার পরিবার ও সম্প্রদায়ের ও গুরুত্ব রয়েছে। তৃতীয়ত : অধিকারের পরিধি বিশ্বময়। এটা স্বীকার করা হয়েছে যে আইনী অধিকারের সঙ্গে মানব অধিকারকে এক করে ফেলা চলবেনা। মানব অধিকার ও নৈতিক অধিকারের সঙ্গে আইনি অধিকারের কিছু কিছু মিল আছে, আইনি স্বীকৃতির জন্য মানব অধিকার সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা কিন্তু নয়। কারণ এখনও কিছু কিছু দেশ রয়েছে যেখানে এদের আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যাইওক, আইনি অধিকারের সঙ্গে মানব অধিকারএকাত্ম করে ফেললেভুল হবে। নৈতিক এবং আইনি অধিকার উভয়ের সঙ্গেই মানব অধিকার কে একাত্ম করে ফেলতে পারা যায়। মানব অধিকারের উৎস হল নৈতিক অধিকার। নৈতিক অধিকারের যথার্থতার ওপরমানব অধকারের যথার্থতা নির্ভরশীল। যাঁরা মানব অধিকারের প্রবক্তা তাঁরা মানব অধিকারের সর্বজনীন আইনি স্বীকৃতির জন্য লড়াই করেন। যেখানে মানব অধিকারের আইনি স্বীকৃতি নেই সেখানে নৈতিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অধিকার বলতে আমরা মোটামুটি ভাবে বুঝি ব্যাক্তির এটা একটা একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। John Locke সর্বপ্রথম অধিকারের তত্ত্ব পেশ করেছেন। এই অধিকার ব্যাক্তিকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য এবং এই অধিকার বলপূর্বক কারোর দ্বারা হস্তান্তরিত হতা পারে না বা যে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। Green মনে করেন অধিকারের উৎস আইন নয় খুব সূক্ষ্ম বিচারে আমরা বলতে পারি যে ব্যাক্তির ব্যাক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রদ্বারা স্বীকৃত সুযোগ সুবিধেরসমষ্টি হল অধিকার। বিভিন্ন রকমের অধিকার রয়েছে। সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অধিকার হল মৌলিক অধিকার। মানব অধিকারের স্বরূপ বুঝতে গেলে দার্শনিকরা মোটামুটি ভাবে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে থাকেন। একটি Will approach Theory আর একটি হল Interest approch theor। প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী স্বাধীনতার অধিকার একটা অধিকার। এটা আমরা বাল গঙ্গাধর তিলকের কণ্ঠে শুনতে পাই। তিনি বলেছেন, "স্বাধীনতা হল আমার জন্মগত অধিকার"। এই একই সুর আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও শুনতে পাই। তিনি বলেন : "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" শেষোক্ত মতবাদ অনুযায়ী স্বাধীনতাকে মৌল মানবিক স্বার্থ বলে স্বীকার করা হয়। মানুষ স্বাধীন বলেই মানবিক স্বার্থের উন্মেষ হয় তা কিন্তু নয়। মানুষের বহুবিধ স্বার্থেরমধ্যে স্বাধীনতা হল একটা স্বার্থ।

বহু আগে সমাজে মানব অধিকারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুভূত হল যে মানব অধিকার রয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে নৈতিক দার্শনিক রা সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সংজ্ঞার মাধ্যে মানব অধিকারের অস্তত্ব স্বীকার করেছিলেন। মানব অধিকারের অস্তিত্ব দেখিয়ে প্রমাণ করাযায়ে না। এটার অর্থ নয় যে তারা আদৌ অস্তিত্ব বান নয়।

American Declaration of Independence অনুযায়ী সমস্ত কিছু

অবিচ্ছেদ্য অধিকারের দ্বারা পোষিত। এই অবিচ্ছিদ্য অধিকারের মধ্যে সবিচ্চেদ্য উল্লেখযোগ্য হল প্রার্য স্বাধীনতা এল সুখের অধিকার।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা

সক্রিয় ধ্যনএবং গভীর তাত্ত্বিক প্রণয়ন পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে হলেও আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে দর্শন কিভাবে পরিবেশগত সঙ্কট যা নীতি সমগ্র মানবপতিকে চিন্তান্বিত করে ফেলেছে সমাধান করতে পারে , Earnest Patridge খুব সার্থকভাবে প্রশ্ন তুলেছেন । পরিবেশ বাদী (Enviromentalist একটা প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিল। তিনি কি দর্শনকে পরিহার করে চলতে পারবেন । এই প্রশ্নের উত্তর দানে পরিবেশগত নীতি বিদ্যার প্রয়োজন এসে পড়ে ; পরিবেশকে ভালবাসার জন্য যে প্রতিন্যাসের প্রয়োজন মানুষের মধ্যে তা গড়ে তুলবে এই পরিবেশগত নীতিবিদ্যা । শুধু তাই নয় পরিবেশ সংরক্ষনেরজন্য যে পরিকল্পনার প্রয়োজন তাও গড়ে তুলবে। পরিবেশগত নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমাণ করা ছাড়াও এর সামনে যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে তারও সমাধান প্রয়োজন । তিনটি মৌল প্রত্যয় কে যথা, নিম্নশ্রেনীর প্রাণীর মূল্য, পরিবেশগত ভারসাম্য (Ecological Balance) এবং প্রবাহমান গতিবৃদ্ধি (Sustainability) । এ সবগুলো আলোচনা করার আগে পরিবেশগত নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রয়োজন।

পরিবেশ বলতে আমরা কী বুঝি ? শিক্ষার্থির কাছে আর পাঁচজন সামাজিক মানুষের মত সমাজই হল সবচেয়ে বড় পরিবেশ, কারণ সহজেই অনুমেয়, সমাজ ছাড়া শিক্ষার্থীও বাঁতেপারেনা। সমাজের কাছে অন্যান্য সামাজিক জীবের মতই তার প্রত্যাশা। দিনের বেশির ভাগ সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেনীকক্ষে সময় কাটায়। তাদের জানা দরকার তাদের কাছে কী প্রতাশা করা হচ্ছে । শ্রেনীকক্ষে ব্যবহৃতবিভিন্ন প্রতীকের অর্থকী ? এখন কি করতে হবে ? এটাও ঠিক শ্রেনীকক্ষই সবচেয়ে বড় পরিবেশ শিক্ষার্থির কাছে। আবার শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীদের কলকাকলি তে মুখর হলেও তার অর্থ হতে পারে তারাআনন্দের সঙ্গে নিজেদের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। সুতরাং সুশৃঙ্খল পরিবেশ হচ্ছে এমন পরিবেশ যাতে প্রত্যেক - শীক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ে - সঠিক ভাবে জানতে পারে যে তারা কী করছে ;সাবলীল, আনন্দময় শ্রেণীকক্ষ সহজে বিশৃঙ্খল নিবারণ কে কার্যকর শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম সোপান হল শিক্ষার্থীর কাছে যানা কী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষ তাকেসংগঠিত করা।

পরিবেশ চেতনা একটা গুরুত্বপূর্ণবিষয় ; এই পরিবেশের নানা ব্যাক্তি, বিভিন্ন দল, সংগঠন প্রভৃতির মধ্যে যে আন্তর সম্পর্ক থাকে তারই ক্রমবিকাশ । যেসব মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানব আচরণ ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁরা সুখবদ্ধতা (Gregariousness) নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তিরঅস্তিত্ব স্বীকার করেন

টিপ্পনী

এবংতাঁদের মতে মানব জীবনের সামাজিককরণ (Socialisation) এরপেছনে এই প্রবৃত্তির ভূমিকাই সবচেয়ে শক্তিশালী । সামাজিক আচরণের উপযোগী মানসিক সংগঠন, নির্ভর প্রবণতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, দয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট গুলো মানব জীবনের মধ্যে প্রথম থেকেই নিহিত থাকে । উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যেগুলো আত্মপ্রকাশ করে।

টিপ্পনী

মানব শ্রেনীভুক্ত জীবের ক্ষেত্রে সহজাত প্রবণতা ওসমাজধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশই যে সবচেয়ে বড় শক্তি যেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দেখা গেছে যে জন্ম থেকে শিশু যদি সমাজধর্মী পরিবেশে মানুষ না হয় তাহলে যে অসামজিক জীব হিসেবে বেড়ে ওঠে।

প্রশ্নাবলী

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র

টিপ্পনী

১. পুরুষার্থ বলতেকি বোঝ? পুরুষার্থের মধ্যে কোন্‌টি তোমার কাছে চিত্তাকর্ষ বলে মনে হয়?

২. তুমি কী মনে কর চার্বাকদের কোন নৈতিক মতবাদ আছে? তা যদি হয় সেটা কী এবং তার সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা কর।

৩. বুদ্ধদেবের অহিংসার নীতিতত্ত্ব আলোচনা কর।

৪. বুদ্ধদেবের অহিংসার নীতিতত্ত্ব আলোচনা কর।

৫. সর্বং দুঃখং (সবই দুঃখময়) বুদ্ধদেবের বক্তব্যের সঙ্গে তুমি কি একমত?

৬. ত্রিরত্ন বলতে কি বোঝ?

৭. চার্বাক মতাবলীর বৈদিক আদর্শ ব্যাখ্যা কর ও সমালোচনা কর।

৮. জৈন নীতিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা কর।

পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র

১. নৈতিক আত্মগত সুখবাদের স্থুল ও মার্জিত রূপ ব্যাখ্যা কর। এই মতের অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

২. সার্বিক সুখবাদ বা উপযোগিতাবাদ আলোচনা কর।

৩. ব্যাক্তির সুখের থেকে সামাজিক সুখ - গণনার কি কি অসুবিধা? ব্যাক্তি - সমষ্টির বিরোধ দূর করা যায় কি? আলোচনা কর।

৪. শর্তাধীন ও শর্তহীন আদেশের পার্থক্যকি? Kant কেন নৈতিক আদর্শকে শর্তহীন বলেচেন আলোচনা কর।

৫. Kant এর মতে নৈতিক নিয়মের স্বরূপ আলোচনা কর।

৬. Kant এর নৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধে তোমার বক্তব্য বিশদভাবে বল।

৭. সদিচ্ছা বা শুভেচ্ছা Kant এর মতে কি? এই ইচ্ছাই একমাত্র স্বতো মূল্যবান কেন?

৮. কর্তব্যবোধে কর্তব্য করার উদাহরণ দাও।

৯. সুখবাদ, বুদ্ধিবাদ ও পূর্ণতাবাদের সম্বন্ধ নির্ণয় কর।

১০. নৈতিক আদর্শ তোমার মতে কি রকম হওয়া উচিত আলোচনা কর।

টিপ্পনী

NOTES

NOTES